গিরিশচন্দ্র

Girischandra Ghosh Lectures

গিরিশচন্দ্র

৺ দেবেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৩৯

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg. No. 1220B-- July, 1939—E.

নিবেদন

বয়স্‌—অশীতি বর্ষে—
বার্দ্ধক্যের বিষ-স্পর্শে
সর্ব্বহর কাল সবই করেছে বিনাশ।
শক্তিহীন, ক্ষীণ স্মৃতি,
কাব্যে অনুরাগ, প্রীতি,
সকলই গিয়াছে—আছে বাকি মাত্র শ্বাস॥
ন্যস্ত—বিশ্ববিদ্যালয়—
গুরুভার এ সময়,
শঙ্কা বাসি' করিতে গ্রহণ;
কাব্যের বিচারে ভয়,—
যদি কিছু ত্রুটি হয়,
ক্ষমিবেন নিজগুণে সহৃদয় জন।
শিক্ষাপ্রার্থী অকিঞ্চন,
নাহি অন্য আকিঞ্চন;
কৃপা করি কৃপাদানে হয়ো না কৃপণ॥

সমর্পিব শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি কবি প্রতি,
হে গিরিশ, লহ দীন ভক্তের প্রণতি॥

২৬, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা
১৪-৯-৩৮

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

উৎসর্গ

শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ.,

স্নেহাস্পদেঃ

ভাই গোপাল,

নাট্য-চর্চ্চায় তোমার আবাল্য অনুরাগ। তাই আমার সযত্ন-পরিকল্পিত গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্য-সমালোচনা তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

তোমার দাদা

ভূমিকা

গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী-সম্বন্ধে আলোচনা এত সংক্ষেপে শেষ হইবার নয়। তাহাতে বক্তা বা শ্রোতা উভয়েরই অতৃপ্তি। সজীব রসমূর্ত্তিসকল সৃষ্টি করা যেমন ধ্যান-সাপেক্ষ, কবির রসরচনা উপভোগ করাও তেমনই ধ্যানসাধ্য। গিরিশচন্দ্র ধ্যানী ছিলেন। 'চৈতন্যলীলা'-রচনার সময় একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম—'মস্ত এক চাকামুখো বলরাম হা-রে-রে-রে ব'লে গান করতে করতে আস্‌ছে।' ঐ ক'টি কথা গিরিশচন্দ্র বলরামের মুখে প্রথম যোজনা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার অনেক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও নিগূঢ় ভাবের উল্লেখ করা হইল না।* লোকে বলে—'অধিক মন্থনে হলাহল উঠে।' কিন্তু কাব্য-সাগরে বিষ নাই—কেবল সুধাই আছে। অধিক মন্থনে গরল উঠিবার আশঙ্কা নাই। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যত অধিক আলোচনা হইবে, ততই মঙ্গল।

বর্ষে বর্ষে গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে এই আলোচনা করিবার সুযোগ দান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসপিপাসু জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন—ইহা নিঃসন্দেহ।

কিমধিকমিতি।

বাগবাজার, কলিকাতা
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

বিনীত
গ্রন্থকার

* নানারূপ শোক-তাপ রোগ-জীর্ণ শরীর ও মন লইয়া প্রবীণ গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশানুযায়ী গিরিশ-বক্তৃতার জন্য প্রবন্ধ-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সহসা নিদারুণ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি তাড়াতাড়ি দুইটি বক্তৃতা দিবার উপযোগী প্রবন্ধ রচনা করিয়া দেন। ইচ্ছা ছিল, পুনরায় সুস্থ হইয়া প্রবন্ধাবলী সম্পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি ৯ই নভেম্বর ১৯৩৮ তারিখে পরলোক-গমন করেন।

গিরিশচন্দ্র

প্রথম অধ্যায়

জীবনের শেষ অঙ্কে এক রাত্রি সাধারণ-কর্ত্তৃক 'সীতার বনবাস' অভিনয় করিতে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রস্তাবনা-স্বরূপ লিখিয়াছিলেন—

"পিতার স্থানীয় যাঁরা, রঙ্গালয়ে আসি তাঁরা
কতবার এ দাসেরে দেছেন উৎসাহ।
সমান-বয়স্ক জন, বান্ধব স্বজনগণ
করেছেন অভিনয়-দর্শনে আগ্রহ॥
পুত্র-সম বয়ঃক্রমে, তাঁরাও দর্শক ক্রমে,
ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাঁরা জনক এখন।
করে কর পুত্র-সনে, এবে হেরি রঙ্গাঙ্গনে,
অবিরাম বহে মম শ্রমের জীবন॥
হৃদে সাধ বলবান্, সম উৎসাহিত প্রাণ
করিতে দর্শকবৃন্দ-মানস-রঞ্জন।
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে হায়, দিন দিন ক্ষীণ কায়,
বিফল প্রয়াস জন-মন-বিমোহন॥

অঙ্গ নহে ইচ্ছাধীন, কণ্ঠস্বর রসহীন—
পূরাইতে মনসাধ ঘটে বিড়ম্বনা।
ত্রুটি হবে অভিনয়ে, তাই রসভঙ্গ-ভয়ে
ক্ষণেকের তরে হয় যৌবন-কামনা।
ভরসা কেবল মম শ্রোতার মার্জ্জনা॥”

আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে! ‘সধবার একাদশী’র সেই প্রথম অভিনয়-রাত্রি!—

“মদে মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে—
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।”

অতঃপর কত অভিনয়-রজনী একে একে কেহ তাঁহার কণ্ঠে সাফল্যের বিজয়-মাল্য, কেহ মস্তকে যশের গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

মনে পড়ে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ‘সীতার বনবাসে’ রাম-চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। —এখনও তাঁহার মানস-পটে সে-স্মৃতি জাগরূক। সমস্ত রঙ্গমঞ্চ যেন অশ্রু-তরঙ্গে টলটলায়মান! এমনই কত রজনী আসিয়াছে— গিয়াছে। এত দিন যে গিরিশ বৃটন-বিজয়ী সিজারের ন্যায় সগর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণ-সমক্ষে পদার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—‘I came, I saw, I conquered’—আজ কোথায় সে আত্মপ্রত্যয়! এখন তাঁহার—

“বার্দ্ধক্যে অশক্ত দেহ— কৃপার প্রয়াস,
হৃদে সদা আতঙ্ক-সঞ্চার;
কাটে দিন, নাহি রহে, স্মৃতি মাত্র কথা কহে,
গোধূলি-আলোক পিছে—সম্মুখে আঁধার।
শূন্য প্রাণ—কিছু নাই আর!”

শ্রমার্জ্জিত বিদ্যা, ক্লেশার্জ্জিত কলাজ্ঞান, কষ্টার্জ্জিত অভিজ্ঞতা, বিলাস-বর্জ্জিত সাধনা, আর সর্ব্বোপরি পরিমার্জ্জিত রুচি আজ সকলই নিষ্ফল! একদিন যেখানে তিনি দাতা, আজ তথায় তিনি প্রার্থী! আজ সম্বল থাকিতেও তিনি নিঃস্ব! সকলই ছিল, সকলই গিয়াছে। এখন চরম ভরসা—শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা, আর পরম সম্বল--তাঁহার নাম।

কথা আছে, "নট-নাপিত-নর্ত্তকী" বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।--

"দেহ-পট সঙ্গে নট সকলই হারায়।"

তখন তাঁহারা পূর্ব্ব গৌরবের উপস্বত্ব ভোগ করেন মাত্র।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়-শক্তি ক্রমশঃ অপহৃত হইতেছে বুঝিয়া গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের সহিত সংস্রব পরিত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিলেন এবং একদিন পরমহংসদেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন—

গিরিশ—"থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দি', মনে করছি।"

রামকৃষ্ণ—"না, না, ও বেশ আছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।"

গিরিশচন্দ্রের জীবনের দুইটি দিক্ ছিল—নট ও নাট্যকার। নটের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু নাট্যকার—বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের ন্যায় inspired নাট্যকার—অমর। দেবকৃপা যে কোন্ দিক্ দিয়া মানুষকে বরণ করে, তাহা অভাবনীয়। অভিনয়ের যশ ক্ষুণ্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় গ্রন্থকারের যশ শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সকলেই

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল—জীবন-দীপ ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিভা-শিখা উজ্জ্বলতর কান্তি ধারণ করিয়াছে। অন্ততঃ তাঁহার শেষরচনা 'তপোবল' সেই পরিচয়ই প্রদান করে।

সম্প্রতি গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে যত্নবান্ হইয়াছেন। এ প্রয়াস নিরর্থক নহে। জাতীয় মহাকবির প্রতি জাতীয় উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন নিরতিশয় গৌরবের বিষয়। বিজ্ঞান ও দর্শন সম্যগ্‌ভাবে লোক-কল্যাণ সাধন করে—সন্দেহ নাই। কিন্তু রস-সাহিত্যের অধিকার মানবের হৃদয়ের উপর। এই জন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিককে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন প্রদান করিয়া কবিকে আমরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করি। কবি আমাদের হৃদয়-রাজ্যের অধিকারী। যুগযুগান্তর পূর্বে মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার পাশ্চাত্ত্য জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার জীবনের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কোন একটি ঘটনা বা কাহিনী আবিষ্কার করিবার জন্য কত নিষ্ফল উদ্যম, নিরর্থক প্রয়াসের অপব্যয় হইতেছে! কি সে দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল, যাহা পণ্ডশ্রম স্বীকার করিয়া অনিশ্চিতের পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ ধাবিত হয়,—যাহা বার বার ব্যর্থকাম হইয়াও এতদিনে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইল না! ইহার এক কারণ কবির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে চায়। তাহার আহার, বিহার, রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় পাইবার জন্য সমুৎসুক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ (খৃঃ ১৮৩৬) হইবার আট বৎসর পরে (খৃঃ ১৮৪৪) তাঁহার প্রিয় ভক্ত গিরিশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। যে দীনবন্ধুর (খৃঃ ১৮৩০) 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমে এই অদ্বিতীয় অভিনেতার প্রথম প্রতিষ্ঠা, তিনি তখন কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। 'হুতোম'-রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ (খৃঃ ১৮৪১), যিনি 'গৈরিশী'-ছন্দের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন, তিনি তখন তিন বৎসরের শিশু। বঙ্কিম, হেমচন্দ্র (খৃঃ ১৮৩৮) ষড়্‌বর্ষীয় বালক। মধুসূদন (খৃঃ ১৮২৪) বিংশতিবর্ষীয় যুবক। গিরিশ যাঁহাকে ভাষার জীবন-দাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় (খৃঃ ১৮২০) তখন যৌবনের মধ্যাহ্ন-গরিমায়। গুপ্ত-কবি (খৃঃ ১৮১১) খ্যাতি-যশে প্রবীণ। দাশরথি (খৃঃ ১৮০৪) প্রৌঢ়বয়স্ক।

বাঙলায় তখন আলোক ও অন্ধকারের মধ্য যুগ। এক দিকে পুরাতন যুগ অবসিতপ্রায়, অন্যদিকে নূতন যুগের অভ্যুদয়। এক দিকে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, দাশরথি, ঈশ্বর গুপ্ত এবং কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, হাফ-আখড়াই, যাত্রা-পাঁচালীর যেমন প্রভাব ও প্রাদুর্ভাব, অন্য দিকে মনীষী রামমোহন রায়ের (খৃঃ ১৭৭৪) প্রচেষ্টায় তেমনই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আদর্শের আবির্ভাব। পতিত ভূমিতে দেখিতে দেখিতে যেমন আগাছা গজাইয়া উঠে, বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে তেমনই ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। পরে যখন ভারতের তদানীন্তন রাজধানী- সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট হিন্দু কলেজ এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিলেন, ও ক্রমে যখন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখ আচার্য্যগণের যত্নে ও চেষ্টায় আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, তখন শালগ্রাম শিলা অব্যবহার্য্য নুড়ির মত গড়াগড়ি যাইতে লাগিল—হিন্দুর সংস্কার—আচার বলিয়া আর কিছুই রহিল না। প্রাচী ও প্রতীচীর এই ভাব-সঙ্গম-যুগে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। সাময়িক আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, প্রতিভাও অতিক্রম করিতে পারে না। এই জন্য তাঁহার রচনায় প্রাচ্যের আলোক ও প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যেরও ছায়াপাত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম, নীতি বা সমাজের সমস্যা, সেখানে তিনি দ্বিধাহীন দৃঢ়চিত্তে হিন্দু ভাব ও সংস্কারের অনুসরণ করিয়াছেন। ইব্‌সেন-প্রণীত A Doll's House নামক নাটকের নায়িকা 'নোরা' পতি-প্রেমে প্রতারণা-পাপে লিপ্ত হইতে কুণ্ঠিতা হয় নাই। কিন্তু 'বলিদান' নাটকে স্বামীর তীব্র তাড়না সত্ত্বেও পতিপ্রাণা 'জোবি' দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছে—"আমি চুরি করব না" (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)।

হিন্দুর দাম্পত্য-নীতি পতিকে পরম দেবতাজ্ঞানে একনিষ্ঠ প্রীতি-ভক্তি-প্রেমদানের পক্ষপাতী হইলেও ধর্ম্মসঙ্গত আচরণে নারীর ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য বিকাশের বাধা কোথাও নাই। যে অব্যভিচারিণী সেবা ও ভক্তি দেব-বিগ্রহে সমর্পণ করাই পবিত্র ভাগবত ধর্ম্মের আদর্শ, স্বামীকে সজীব বিগ্রহজ্ঞানে সেই শ্রদ্ধা প্রীতি দানই আর্য্যধর্ম্মের অভিমত। হিন্দুর বিবাহ যৌন-সম্মিলন নয়,—আত্মার সহিত আত্মার প্রেম-বন্ধন। এই একনিষ্ঠ প্রেমই সতীত্ব এবং এই একনিষ্ঠ সাধনা হইতেই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি এবং বিশ্বপ্রেমের বিকাশ হয়। অধুনা যুগ-পরিবর্ত্তন এবং বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে এই

সনাতন আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া জাতীয় লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে।

গিরিশের ব্যাবহারিক জীবন কর্ম্মবহুল হইলেও তাঁহার প্রকৃত কবি-জীবন ছিল ভাবময়। এই সদানন্দময় পুরুষের জীবন-সহচর ছিল দুঃখ। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ছিল—বিশাল এবং উজ্জ্বল; কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হইত, সে চোখের পিছনে শোক যেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। কবির শিক্ষাস্থল বিশ্ববিদ্যালয় নহে—প্রকৃতির পাঠশালা। কিন্তু প্রকৃতি কঠোর শিক্ষয়িত্রী। দুঃখ-শোক-লাঞ্ছনার বহুল ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘর্ষে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইয়াছিল। ফুল যখন সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া সৌরভ বিস্তার করে, তখন বুঝা যায় না যে, কত প্রতিকূল শক্তির সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে দিনের পর দিন কঠিন মাটি হইতে রস সঞ্চয় করিয়া সূর্য্যের প্রখর তাপে সে আত্ম-বিকাশ করিয়াছে এবং রসপিপাসু ভৃঙ্গকে হৃদয়মধু দান করিতেছে।

পিতার আদরে ও মাতার হতাদরে গিরিশের বাল্যজীবন গঠিত। বহু বিপরীত ভাবের অপূর্ব সমাবেশে ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে গিরিশের নিজ জীবন ও চরিত্র একখানি জীবন্ত নাটক ছিল। বিধাতা যেন তাঁহাকে আজন্ম নাট্যকাররূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "একাধারে এমন ঔদাস্য ও আমোদপ্রিয়তা, আলস্য ও উদ্যম, ধৈর্য্য ও চাঞ্চল্য, সাহস ও ভয়, গর্ব্ব ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা,— এমন দীর্ঘসূত্রতা, বিচারশীলতা ও হঠকারিতা, দম্ভ ও দীনতা, ভাবুকতা, ভাবপ্রবণতা ও বিষয়বুদ্ধির একত্র অধিষ্ঠান,—এমন সংশয় ও বিশ্বাস, জড় ও অতীন্দ্রিয় জড়িত,

সদসৎ-কর্তৃক সমভাবে চালিত, দেব-দানব আশ্রিত, মমতা ও বৈরাগ্য মিশ্রিত,—এমন পুরুষকার ও দৈব নির্ভরপরায়ণ অদ্ভুত প্রকৃতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।" এই সকল বিরোধী গুণের একত্র সন্নিবেশ দেখিয়া কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, 'গিরিশ ঘোষকে যতই দেখ্‌ছি, ততই মনে হচ্ছে চিন্‌তে পারছি নি।' গিরিশ একাধারে মানব ও ভৈরব ছিলেন।

এক দিকে গিরিশ যেমন সাহসী, অন্য দিকে তেমনই ভীরু ছিলেন। কোন সময় তিনি একজন সাঁওতালের সঙ্গে সাঁওতাল পরগনার একটি পাহাড় দেখিতে যান। সন্ধ্যা হয় হয়, দূরে ব্যাঘ্রগর্জ্জন শোনা গেল। সাঁওতাল বলিল, 'বাবু, ঘর্‌কে চল্‌।' গিরিশ জিজ্ঞাসিলেন, 'কাছে কোথাও গুহা আছে?' সাঁওতাল গুহা দেখাইয়া বলিল,—'ওখানে দেও আছে।' গিরিশ ভাবিলেন, ভূতকে দুটো মিনতি ক'রে বল্‌লে শুন্‌বে, বাঘ কোন কথাই মান্‌বে না। তিনি সেই গুহা-মুখে আপনার চাদরখানি পুড়াইয়া ও শুষ্ক পত্রে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার ভিতরে রাত্রি যাপন করেন। অন্য দিকে দেখিয়াছি, তাঁহার এমন গা ছম্‌ ছম্‌ করিতেছে যে, গায়ে হাত দিয়া কাছে বসিয়া না থাকিলে ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

গিরিশের চরিত্রের এই বিপরীত ভাবসমূহ দৃষ্টান্ত-দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে বাজারে প্রচারিত জীবনচরিত ছাড়া আরও একখানি জীবনচরিত লিখিতে হয়। আমি মোটামুটি দুই-চারিটা কথা বলিব। জীবনের নগণ্য আচরণে মানুষ আপনাকে ধরা দেয়, বৃহৎ অনুষ্ঠান সে সতর্ক হইয়া করে। গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাঁহার দৈনন্দিন আচরণ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে।

কার্য্যের সময় গিরিশ অক্লান্ত—শত হস্তে কাজ করিতেন। কিন্তু অন্য দিকে—চলিত কথায় যাহাকে 'গেঁতো' বলে, তিনি ছিলেন তাহার প্রতিমূর্ত্তি। নাট্যকার ও বাগ্মী শেরিডনের সঙ্গে সমস্বরে বলিতেন—'Never to do to-day what you can put off till to-morrow'—'যে কাজ কাল্‌কের জন্য ঠেলে রাখা যায়, আজ তা কদাচ করবে না।'

এক দিকে গিরিশ ছিলেন যেমন ধৈর্য্যশালী, অন্য দিকে তেমনই ব্যস্তবাগীশ। যে কেহ তাঁহাকে কোন কার্য্যের জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে অথবা নাট্যশিক্ষা-দানের সময় লক্ষ্য করিয়াছেন,—তিনিই তাঁহার অবিচলিত ধৈর্য্যের কথা অবগত আছেন। বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকা, বা প্রতিনায়ক-প্রতি-নায়িকার শিক্ষায় ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইত। অন্য ভূমিকাগুলি প্রায়ই অপর ব্যক্তি শিক্ষা দিতেন। পাত্র বা পাত্রী তাঁহার যত্নের দান গ্রহণ করিতে পারিতেছে না—হতাশে অবসন্ন হইয়া অব্যাহতি চাহিতেছে। গিরিশ কিন্তু অদম্য উৎসাহে পুনঃ পুনঃ অভিনয় করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন,—'এই দেখ কত সহজ! তুমি কি কখনও এরূপ অবস্থাগত কাহাকেও দেখ নি? মনে ক'রে দেখ, এরূপ অবস্থায় ঠোঁটের কোণ এম্‌নি কুঁচ্‌কে যায়। চোখের ভাব এম্‌নি হয়। কপালের শির ফুলে ওঠে। তার কথায় এম্‌নি জড়তা আসে। এম্‌নি ক'রে চলে' ইত্যাদি। এমনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে, গিরিশের বিরাম নাই। শরীরের, বিশেষতঃ মুখের মাংসপেশী, শিরা-উপশিরার উপর তাঁহার অনন্যসাধারণ আধিপত্য ছিল। আবার অন্য দিকে, কোন প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য কাহাকেও ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

প্রায়ই দেখা যাইত, কল্পিত বিলম্বের ব্যগ্রতায় গিরিশ তাঁহার বসিবার কক্ষের সম্মুখস্থ ছাদে দ্রুত পাদচারণা করিতেছেন, অথবা উত্তেজনায় বাড়ীর মোড়ে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আবার রচনায় মনের মত একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, দিনের পর দিন তাহার জন্য হাওয়ায় ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছেন।

আপনার রচনা-সম্বন্ধে এরূপ স্থির-বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। বলিতেন, 'যদি রক্ষা করবার মত এক ছত্রও কেউ লেখে, কাল সেটিকে সযত্নে তুলে রাখ্‌বে। তার জন্য তোমার আর চেষ্টা করবার দরকার নেই।' তিনি বলিয়া যাইতেন, একজন লিখিত। লেখা শেষ হইলে তিনি মুদ্রাঙ্কনের জন্য বড় ব্যস্ত হইতেন না। ছাপার ভুলের জন্যও তাঁহাকে কখনও চিন্তিত হইতে দেখি নাই। বলিতেন, 'যিনি সমঝদার, তিনি বুঝিয়া লইবেন।' 'সীতার বনবাস' নাটকে রাবণ-নিধনের পর শ্রীরামচন্দ্র মন্দোদরীর চিত্র দিতেছেন—

"মন্দোদরী এলায়িত-বেণী,
দুনয়নে প্রবাল নির্ঝর-স্রোত,
কাঁদিল রূপসী—"

(সীতার বনবাস, ১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

পুস্তকে ছাপা হইল, 'প্রবল নির্ঝর-স্রোত।' এ সম্বন্ধে গিরিশের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে বলিলেন, 'শুদ্ধি-অশুদ্ধি-পত্রের প্রয়োজন নেই, লোকে বুঝে নেবে।' রচনারম্ভে তাঁহার দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়া রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারিগণ কখন কখন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। কিন্তু একবার লেখা আরম্ভ করিলে কার্য্য আপনার উত্তেজনায় আপনি অগ্রসর হইত। গিরিশ

তখন যেন কোন অলক্ষ্য যন্ত্রীর যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া থাকিতেন। বলিতেন, 'ঠিক যেন ঘাড়ে ভূত চাপে।'

গিরিশের গর্ব্ব ছিল, 'দেব-গুরু-প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।' কিন্তু কোন সময় তাঁহার জীবনী লিখিবার প্রস্তাব উত্থাপন করায় অতি দীনভাবে বলিয়াছিলেন—'ছি ছি! আমার আবার জীবনী!' তাঁহার চরিত্র বহু দোষের আধার ছিল বলিয়া যে এরূপ বলিতেন, তাহা নহে। দোষ-গুণ তিনি কিছুই গোপন করিতেন না। বলিতেন—'Paint me as I am'—'আমি যেমন তেমনই আমায় অঙ্কিত কর।' দীনতায় আপনাকে 'নোটো গিরিশ ঘোষ' বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি কখনও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।

প্রচণ্ড ক্রোধের বশীভূত হইয়া ন্যায়-অন্যায়ে গায়ে হাত তুলিতে গিরিশের কখনই কুণ্ঠা হইত না। কিন্তু অপরাধ যতই গুরুতর—অমার্জ্জনীয় হউক, তাঁহার উদার ক্ষমাশীলতায় সবই ভাসিয়া যাইত।

যৌবনে পান, তামাক, পুরাণ-প্রসঙ্গ, রঙ্গভূমি ও অধ্যয়নে গিরিশের বিশেষ আসক্তি ছিল। যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের চরণাশ্রিত গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ চিত্রের সহিত পরিচিত নহেন। জীবনের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কোন প্রসঙ্গ বড় শুনা যাইত না।

গিরিশচন্দ্রের হৃদয় ছিল অকপট স্নেহময়; আন্তরিকতা ছিল তাঁহার প্রধান গুণ; আর বালকের সারল্য তাঁহার স্বর্গীয় ভূষণ। তাঁহার চিত্ত ছিল যেমন স্বচ্ছ, অন্তর ছিল তেমনই প্রশস্ত—উদার; মনের গোপন কোণে কোথাও

চোরকুটুরি ছিল না। তাঁহার দেহে ছিল যেমন মদমত্ত হস্তীর বল, চিত্তে ছিল তেমনই পুরুষোচিত পৌরুষ। ভোজন-প্রিয় গিরিশচন্দ্রের আহার করিবারও শক্তি ছিল অসীম।

গিরিশ প্রথম জীবনে দাসত্ব করিতেন, কিন্তু কখন আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দেন নাই। যে আপিসে (Atkinson Tilton & Co.) তিনি কর্ম্ম করিতেন, সেখানে একবার এক আহেলা-বিলাত আসিয়া নিয়ম জারি করিলেন, তিনি ঘণ্টা বাজাইলেই কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার ঘণ্টা বাজিত। এইরূপে গিরিশের একদিন ডাক পড়িল। অন্যান্য কেরানি ছুটিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, গিরিশ কিন্তু নড়িলেন না। ঘণ্টাবাদক অবশেষে মহা বিরক্ত হইয়া বড় সাহেবের কাছে নালিশ করিলেন। অ্যাট্‌কিন্‌সন্ গিরিশকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছোট সাহেব ডেকে ছিলেন, তুমি শোন নি কেন?'

উত্তর—'কৈ। ছোট সাহেব ত আমাকে ডাকেন নি!'

আহেলা-বিলাত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, 'কি! আমি পুনঃ পুনঃ ঘণ্টা বাজিয়েছি!'

মুচ্‌কিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিতে হাসিতে বড় সাহেব গিরিশের মুখের দিকে চাহিলেন। গিরিশ বলিলেন, 'সাহেব, I am not accustomed to move by the bell—ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে নড়া-চড়া করা আমার অভ্যাসও নাই, স্বভাবও নয়।'

অ্যাট্‌কিন্‌সন্ বলিলেন, 'ঠিক! গিরিশ আমার আপিসের

মান রক্ষা করেছে। ভদ্রলোকে ও বেহারাতে যে পার্থক্য আছে, তা গিরিশই বুঝিয়েছে। ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। ও নিয়ম তুলে দাও।'

অত্যধিক আমোদপ্রিয়তাই ছিল গিরিশ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহারই অসংযত প্রভাবে তিনি কুপথে-সুপথে সমভাবে চালিত হইয়াছেন। কিন্তু যে আমোদ যখনই বিস্বাদ বোধ হইত, মধুপানান্তে ভৃঙ্গ যেমন পুষ্পকে পরিত্যাগ করে, তিনিও সেইরূপ তখনই তাহাতে ঔদাস্য প্রদর্শন করিতেন। কেবল শেষজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে উচ্চ আমোদের আস্বাদ পাইয়া চেষ্টা সত্ত্বেও হীন আমোদে রত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বলিতেন, 'পরমহংসদেবের সঙ্গতেও যদি আমোদ না পেতুম, আমি যেতে পারতুম না।' 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকে উপেন্দ্র বলিতেছেন, "উচ্চ আমোদের আস্বাদ না পেয়ে নীচ আমোদে রত হয়েছে। সঙ্গগুণে বুঝেছে, জীবনের সার এই কুৎসিত আমোদ" (৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)। এ তিরস্কার গিরিশচন্দ্র নিজেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ এই ঔদাসীন্যবশতঃ তিনি অধোগতি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সঙ্কটে, উদ্বেগে, উৎকট দুশ্চিন্তায় এই ঔদাসীন্য-হেতুই কখনও তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত না। বলিতেন, 'আমি সব বাইরে রেখে মশারির ভিতর ঢুকি।'

এই নাট্যকবির নিজ জীবনে প্রধানতঃ যে কয়েকটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহারই সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিব। প্রথম—সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব। যৌবনের প্রারম্ভে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কোন একটি সম্পত্তি রক্ষা না করায় ঘরে-পরে তাঁহার বিস্তর লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। পাড়ার

লোকে তাঁহাকে বোকা বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। গিরিশ মনে মনে স্থির করিলেন, বিধিমত মিথ্যার আশ্রয় লইয়া চতুর নাম কিনিব। বাল্যবয়সে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে মাতার দণ্ডভয়েও যিনি কখনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, অন্যায়রূপে আহত হইয়া অভিমানে ও গর্ব্বে এখন হইতে তিনি প্রয়োজন হইলে সত্যপথ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু সত্যের প্রতি দৃঢ়ভক্তি ও অনুরাগ কখন তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার অন্তরের অনুতাপ সময় সময় তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শেষজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'গিরিশ সত্য-মিথ্যার পার।'

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব—সুরার সহিত। এই সর্ব্বনাশীর আকর্ষণ ও মোহিনী শক্তি তিনি গদ্যে পদ্যে বহুবার বলিয়াছেন। 'প্রফুল্ল' নাটকে যে যোগেশ-চরিত্র তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার সম অবস্থাপন্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি তাঁহাকে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। শেষজীবনে গিরিশ বলিতেন, 'জন্ম হইতে গুরু আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নাস্তিকতার দম্ভে তাহা বুঝিতে পারি নাই।'

গিরিশের তৃতীয় দ্বন্দ্ব কল্পনা ও কর্ম্মশক্তিতে। কল্পনা কর্ম্মশক্তিকে গ্রাস করিয়া কত কবি-জীবন যে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। গিরিশ এ দ্বন্দ্বেও জয়ী হইয়াছিলেন।

চতুর্থ দ্বন্দ্ব—সংশয়ে ও প্রত্যয়ে। তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে ইহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চম দ্বন্দ্ব—এক দিকে ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির প্রলোভন, অন্য দিকে উচ্চ প্রকৃতির আকর্ষণ।

ষষ্ঠ দ্বন্দ্ব— হৃদয় ও মস্তিষ্কে। হৃদয় চাহিতেছে ঈশ্বরাশ্রয়; বুদ্ধি বলিতেছে—কেহ কোথাও নাই, শূন্য—শূন্য।

যৌবনে গিরিশচন্দ্র ঘোর নাস্তিক ছিলেন। কয়েকজন বন্ধু-সহ এক সময় তিনি এক গিরি-গুহায় অবতীর্ণ হন। নামা গেল বেশ, কিন্তু উঠিবার পথ পাওয়া যাইতেছে না। ওদিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। গিরিশের বন্ধুগণ বলিলেন, 'তুই নাস্তিক, তোর জন্য আমরাও মরতে বসেছি। তুই ভগবানের নাম কর!' গিরিশ সকলের পীড়াপীড়িতে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেন। তারপর একটা সোজা পথ আবিষ্কৃত হইল। গিরিশ উপরে উঠিয়া বলিলেন, 'যদি কখন ভালবাসায় ভগবানের নাম করতে পারি, তবেই করব, নইলে নয়।' অনেক হৃদয়-দ্বন্দ্বের পর তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় হইলে বলিয়াছিলেন, 'এমন পাপ সৃষ্ট হয় নাই, যাহা ঈশ্বরের নামে নির্ম্মূল না হয়, এমন দুঃখও সৃষ্ট হয় নাই যাহা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'লে দূর না হয়।' কিন্তু এই আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে তাঁহাকে কত যে ওলট-পালট খাইতে হইয়াছিল, অন্তর্দ্বন্দ্বে—অশ্রুধারে তিনি কত বিনিদ্র রজনী যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহার অন্তর্য্যামীই অবগত।

এই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বকলম দিয়া। এই পুরুষোত্তমের আশ্রয়লাভের (খৃঃ ১৮৮৪) পর গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটকেরই প্লট ও চরিত্রের পরিকল্পনা শ্রীপরমহংসদেব ও শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর আলোকে ও প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত।

মোটামুটি এই কয়েকটি দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘর্ষ উল্লিখিত হইল। গিরিশের জীবন ছিল দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘর্ষময়। নারীজাতির প্রতি অসীম সহানুভূতি তাঁহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। অথচ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—'স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।'

নিন্দা বা সুখ্যাতিতে গিরিশকে কখনও বিচলিত বা অসাফল্যে হতাশ হইতে দেখি নাই। বরং নিষ্ফলতা তাঁহাকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিত।

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত রকমের। সাধারণতঃ তিনি যখন যে ভাবে থাকিতেন, সকল ভুলিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, বা যে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সব স্মৃতির ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকিত এবং প্রয়োজনমত তাঁহাকে যোগাইয়া দিত। এমন কি রচনার সময় আবশ্যক হইলে শৈশবে দৃষ্ট দৃশ্য ও ঘটনা তাঁহার মানস-পটে আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিত।

গিরিশচন্দ্রের হৃদয় ছিল যেমন ভালবাসাময়, প্রকৃতি ছিল তেমনই স্বাধীন, আর স্বভাব ছিল তেমনই মুক্ত। এমন কি বদ্ধ স্থানে বাস করিতেও তাঁহার হাঁপ ধরিত। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু দরজা জানালা বন্ধ করা হইবে না। গিরিশ ঘরের এক কোণে একখানি লেপ জড়াইয়া বসিয়া আছেন।

এক দিকে গিরিশ অত্যন্ত রাশভারি লোক ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাব ধারণ করিলে সহসা কেহ তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। অন্য দিকে তিনি শিশুর ন্যায় চঞ্চল-প্রকৃতি ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র একস্থানে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ রচনার সময়। ভাবের উত্তেজনায় প্রায়ই ছাদে বেড়াইতেন। বৈজ্ঞানিক মতে কবি এবং উন্মাদ একই শ্রেণীভুক্ত; ইঁহাদের স্নায়ুমণ্ডলী সর্ব্বদাই চড়াসুরে বাঁধা থাকে (high-strung)। গিরিশ ইহার চরম দৃষ্টান্ত ছিলেন। ক্রমান্বয়ে একভাবের আঘাত সহিতে পারিতেন না। একদিন কতকগুলি দোলন-চাঁপা ফুল গ্লাসে জল দিয়া বোঁটা ভিজাইয়া কেহ তাঁহার শয়ন-কক্ষে রাখিয়া আসে। ফুলের মৃদু গন্ধে ঘর আমোদিত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে গিরিশের পক্ষে তাহা দুঃসহ হইয়া উঠিল। ফুলগুলিকে স্থানান্তরে রাখিয়া তবে তিনি ঘুমাইলেন।

নিদ্রার পূর্ব্বে গাত্র-সংবাহন তাঁহার নিত্য অভ্যাস ছিল এবং কেহ ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলে তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিতেন। এমন কি কখন কখন তজ্জন্য বেপরোয়া হাত-পাও চলিত। একবার এক নূতন চাকর তাঁহার গা টিপিতে বসিল। গিরিশ বলিয়া দিলেন, 'দরজায় খিল দে। কেউ না হঠাৎ দোর খুলে আমার ঘুম ভাঙ্গায়। আমি ঘুমুলে তুই আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাস্।' সে ব্যক্তি গা টিপিয়া দিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইল। তারপর বাহির হইবার সময় তাহার হুঁস্ হইল, তাই ত দরজায় খিল যে! সে বহুক্ষণ বাহির হইবার চেষ্টার-পর ডাকিল, 'বাবু! বাবু!' হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে গিরিশ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হাত-পা চলিবার পূর্ব্বেই চাকর বলিল, 'বাবু, তুমি ত বল্লে, "আমি ঘুমুলে চ'লে যাস্।" দোরে খিল, আমি বারাই কেমন ক'রে?' ঘটনা বা অবস্থার কৌতুকের দিক্‌টা নজরে পড়িতে তাঁহার

বেশী বিলম্ব হইল না। গিরিশ মনে মনে হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'জান্‌লা, নর্দ্দামা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করেছিলি ?' চাকর বলিল, 'করি নি ! বারাতে লারনু !'

গিরিশের কথাবার্ত্তা ছিল যেমন অস্পষ্ট, রচনা তেমনই সুস্পষ্ট। অভ্যস্ত না হইলে তিনি যে কি বলিতেছেন—সহজে বুঝা যাইত না। কিন্তু তাঁহার রচনার ভাষা ছিল যেমন সুমিষ্ট, সুললিত, ভাবও তেমনই সুস্পষ্ট, অভিব্যক্ত। প্রেম-প্রসঙ্গ ছিল তাঁহার রচনার প্রধান বিষয়। এই প্রেমকে তিনি কতভাবেই না অঙ্কিত করিয়াছেন ! তাঁহার রাবণ লম্পট হইলেও সীতার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আকুল। দক্ষযজ্ঞে লিখিয়াছেন,—"প্রেম-ডুরি সৃষ্টির বন্ধন।" "প্রেমে কুঞ্চিত হৃদয় বিকসিত হয় (মুকুল-মুঞ্জরা)।" "প্রেম ব্যভিচারীকে দেবতা করে (বলিদান—দুলালচাঁদ)।" এই 'দুলাল'-চরিত্র লইয়া সে সময় বহু তর্ক-বিতর্ক উঠিয়াছিল—পিতার সমক্ষে অসংযত রস-ভাব-প্রয়োগ অস্বাভাবিক। কিন্তু দুলালচাঁদের ভাষায় ত রসিকতা নাই; দুলালের সকল কথাই তাহার বিকৃত স্বভাবের উক্তি। মাতা-পিতার অসম্ভব আদরে সে যেমন চরিত্র সংযত করিতে শিখে নাই, তেমনই জিহ্বাও সংযত করিতে পারিত না। পিতৃ-চরিত্রের আদর্শে চরিত্র-শৈথিল্য তাহার ধারণায় দোষাবহ নহে। সকল দোষই সে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত; কেবলসারল্য ও আন্তরিকতা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি।

যে চরিত্রের বীজ দেখেন নাই, গিরিশ সে চরিত্র অঙ্কিত করিতেন না। দুলাল-চরিত্র আমরা দেখিয়াছি, তবে বিরল—সন্দেহ নাই। গিরিশ এই চরিত্র বুঝাইবার জন্য কত না কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। দুলালের কেবল

প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিকৃত নহে, সে বিকলাঙ্গ—খঞ্জ ও কুব্জ। গিরিশ চরিত্রের নামকরণ করিয়াছেন—'দুলাল'। কিন্তু পরিণামে প্রেম তাহাকে দিব্য জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়াছে।

ঠিক কোন্ সময় হইতে আমি গিরিশচন্দ্রের রচনার ভক্তরূপে তাঁহার কাছে পরিচিত হইয়াছি. তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারিব না, তবে সে অনেক দিনের কথা। মস্তকে এখন যেখানে পূর্ণিমার শুভ্র বিভা বিভাসিত, সেখানে তখন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার ছিল। যে ওষ্ঠের উপর আজ শমনের শুভ্র জয়-পতাকা দম্ভভরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শুধু স্মিত-হাস্য বই আর কোন বালাই ছিল না। বয়ঃ-সন্ধির সঙ্গে তখন ব্যাকরণের সন্ধি-সমাস সবে সদ্ভাব স্থাপন করিতে সুরু করিয়াছে। ধাতু ছিল তখন তরুণ এবং প্রত্যয় প্রকৃতিগত। সে সময় মনে হইত, কোন ভেল নাই বলিয়াই বুঝি এমন উপাদেয় বস্তুর নাম 'ন-ভেল' হইয়াছে। সে সময় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী মানুষের মত কথা কহিয়া যে অদ্ভুত উপন্যাস বলিত. মন তাহা অসঙ্কোচে বিশ্বাস করিত। মনে হইত, আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ খুঁজিলেই পাওয়া যায়। এখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে যে সংশয়ের পর্ব্বত উঠিয়াছে, তাহা কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতেও দুর্লঙ্ঘ্য। বাস্তবের কঠোর অভিজ্ঞতায় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী এখন চিরস্তব্ধ। পরশ-পাথর লোহাকে আর সোনা করে না। সোনার কাঠির স্পর্শে সুপ্ত রাজকন্যা আর জাগে না। কল্পনার কুবের-বৈভব-প্রদর্শক আশ্চর্য্য-প্রদীপ চির-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। কিন্তু মনের সে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস বাঁচিয়া থাকিলে, বোধ করি, বড় সুখের হইত। তাহা হইলে সত্য-মিথ্যা, আসল-

নকল, সোনা-পিতল, সাঁচ্চা-ভেল, যাচাই করিতে করিতে প্রাণ যে কুচ্‌কুচে কালো কঠিন কষ্টি-পাথরে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতাম। তাহা হইলে বিজ্ঞানের বিজ্ঞতা, দর্শনের দৃষ্টি, রসায়নের নীরস তৌলদণ্ড লইয়া রস-সাহিত্যের বিচার করিতে বসিতাম না।

কিন্তু বাস্তবিক ঐ ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর উপকথায়, আলাদীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপে, স্পর্শমণি এবং সোনার কাঠি রূপার কাঠিতে কি কোন ভাবগত—রসানুগত সত্য নাই? মানুষ কি এতাবৎকাল কেবল মিথ্যার—নিছক আকাশ-কুসুমের আদর করিয়া আসিতেছে? মানুষের ত সেরূপ স্বভাব নয়! মিথ্যায় তাহার প্রকৃতিগত অরুচি। যিনি প্রয়োজনে-নিষ্প্রয়োজনে করকার মত মিথ্যা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে কেহ মিথ্যা বলিলে তিনিও আন্তরিক চটিয়া বলেন —'বেটা মিথ্যাবাদী!' যে ঠকায় সেও ঠকিতে চায় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কাব্য যদি কেবল অলীক কল্পনা এবং নাটক মিথ্যা জল্পনা হইত, উপন্যাস যদি কেবল কথার বিন্যাস হইত তাহা হইলে কখনই রস-সাহিত্যের এত আদর হইত না। মানব অন্তরে-অন্তরে ইহার সত্যানুভব করে, তাই এই জাতীয় সাহিত্যের এত আদর। এ সত্য যাচাই করিয়া লইতে হয় না। ইহার সাক্ষী-সাবুদ, প্রমাণ-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। মানবের অন্তশ্চক্ষুতে এ সত্যের রূপ স্বতঃই প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হয়। মানবের অন্তরাত্মাই ইহার সাফাই সাক্ষী। যাহাকে আমরা কাল্পনিক চিত্র বলি, তাহা এই সত্যের সংসারে প্রকাশ্য রাজপথে আনাগোনা করিতেছে। সাধারণ লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না;

কিন্তু দৈবশক্তিসম্পন্ন ক্রান্তদর্শী কবির ললাটে আর একটি চক্ষু থাকে,—সেই তৃতীয়-নেত্র-বলে তিনি উহাকে চিনিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময় এই যে, সত্যস্বরূপ এই সকল কাল্পনিক রসমূর্ত্তি আমাদেরই অন্তরের অন্তঃপুরবাসী। দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রকটিত রূপ টাইমন—রাজ্যলিপ্সার ভীষণ দুরাকাঙ্ক্ষারূপে ম্যাক্‌বেথ্‌ আমাদেরই অন্তরে বাস করিতেছে। অমূলক সংশয়ের প্রতিমূর্ত্তি ওথেলো আমাদেরই হৃদয়-কন্দরে অধিষ্ঠিত। রূপজ মোহের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ নগেন্দ্র-গোবিন্দলাল তোমার-আমার মনের ভিতরে কুন্দনন্দিনী-রোহিণীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, সময় ও সুযোগ পাইলেই তাহারা আত্মপ্রকাশ করে। সূক্ষ্মদর্শী লোক-শিক্ষক কবি তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার ভীষণ পরিণাম উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া লোক-চক্ষুর সমক্ষে ধারণ করেন—মানবের অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়।

দেব ও দানব প্রকৃতির মিশ্রণে মানব-প্রকৃতি গঠিত। মানুষচরিত্রে সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ, কু-সু একাধারে বিদ্যমান। সংসার-বৈচিত্র্যে কাহারও সৎ কাহারও বা অসতের দিকে আকর্ষণ অধিক। কর্ম্মফলে মানুষ আপনার অদৃষ্ট-শৃঙ্খল আপনিই গঠন করে। মহাকবি, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার মানবের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলন করিবার জন্য সেই শুভাশুভ কর্ম্মফলের রসোজ্জ্বল চিত্র লোক-সমক্ষে বিকাশ করেন। সে চিত্র এমন হৃদয়গ্রাহী করিয়া অঙ্কিত হয় যে, তাহাতে পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে হয় না। দৃষ্টিমাত্রে মানবের অন্তশ্চক্ষু আপনি উন্মীলিত হয়.

কোন্‌টা হেয়, কোন্‌টা শ্রেয়ঃ, সে নিজেই বুঝিতে পারে। এরূপ উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে।

মানব হঠাৎ একদিন নবজীবনে জাগিয়া উঠিয়া দেখে—তাহার চারিদিকে রহস্য। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। সে দেখে, তাহার আগু-পাছু সমান অন্ধকার। কোথা হইতে সে আসিয়াছে, কোথায় তাহার গতি, কেন সে অন্ধের মত প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কি চায়, কি খুঁজে—সবই জটিল সকলই দুর্ব্বোধ। কিন্তু সকল দুর্ব্বোধ রহস্যের উপর পরম রহস্য সে নিজে। আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা -সে কি চায় তাহাও সে জানে না, কিন্তু তাহা পাইবার জন্য দুষ্ট শিশুর মত দুই বাহু উত্থিত করিয়া সে ছুটিয়াছে! বারবার ব্যর্থ প্রশ্ন করিয়া তীক্ষ্ণ মেধা কঠিন প্রস্তর-প্রায় সে রহস্যের পায় মাথা কুটিতেছে, উত্তর পায় না! বিজ্ঞান, দর্শন, তর্ক যুক্তি সব এখানে মূক সে আবহমান-কাল-পৃষ্ট প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অসমর্থ। কেবল কবিই এই বিচিত্র প্রহেলিকার সমাধান করিতে সমর্থ। তিনি বলিয়া দেন যাহাকে ধরিবার জন্য আমাদের প্রাণ অগোচরে ব্যগ্র, তাহা সেই চিরসুন্দর, -যাহার সৌন্দর্য্যে সৃষ্টি বিভাসিত। যে রসের আকর্ষণে আমরা ছুটিতেছি তাহা আনন্দ। মানবের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলন করিয়া তিনিই দেখাইয়া দেন যে, মিথ্যা মোহে—আপাত-মনোরম বলিয়া যে ভোগের পশ্চাৎ আমরা ছুটিতেছি, যাহাকে লাভ করিবার জন্য সকল চেষ্টা, আগ্রহ একত্র সংযোজিত করিয়া কর্ম্ম করিতেছি, তাহা প্রকৃত ভোগ নহে—কর্ম্মভোগ মাত্র। ক্ষণিক অনিত্য সুখ-ভোগের জন্য ধাবিত হইয়া আমরা কেবল মহাদুঃখকে আলিঙ্গন করিতেছি।

আশা আমাদের প্রতারিত করিতেছে, বাসনার বিরাম নাই, ভোগ তৃপ্তিহীন। যে আনন্দ আমরা চাই, তাহা ভোগে নাই—আছে কেবল ত্যাগে।

মানবের কল্যাণ-উদ্দেশ্যে প্রকৃত রস-সাহিত্যের সৃষ্টি। সে উদ্দেশ্য বিধবা-বিবাহ, বর-পণপ্রথা বা নারীশিক্ষার বাদ-প্রতিবাদ নহে। সমাজ-সংস্কারের বিধি-বিধান নহে। অধর্ম্মের চক্রান্ত-ভেদী ডিটেক্‌টিভের জয়গান নহে। কিংবা তাহা সজ্জন-রঞ্জন দুর্জ্জন-দলন কাব্যও নহে। রস-সাহিত্যের লক্ষ্য উচ্চতর। সংসারে ভাল-মন্দ, কু-সু, মনোজ্ঞ-কুৎসিত. সকল বস্তুরই একটি চিরসুন্দর ভাব আছে, তাহা কেবল কবিরই অনুভূতি-প্রত্যক্ষ। মহাসাধক ভক্তের ন্যায় কবিও সর্ব্বভূতে—সকল বস্তুতে সেই চিরসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—সেই চিরসুন্দরের সৌন্দর্য্য-রসে নিখিল বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে আপ্লুত। "সদসচ্চাহমর্জ্জুন" —সৎ, অসৎ সকলেরই ভিতর চিরসুন্দর বিরাজমান। ললিত রস-সাহিত্য সেই অনন্ত সুন্দর—অনন্ত সত্যের সুললিত জয়গান। তাহার লক্ষ্য—মানবকে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরম্"-এর অভিমুখে আকৃষ্ট করা। ইহারই জন্য কবির অপূর্ব্ব রস-কলা-সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্যে কখন তিনি অপূর্ণ মানবের অন্তর্দৃষ্টির সমক্ষে পূর্ণতর সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধরেন; অথবা কখন স্বার্থ-চালিত, রিপু-তাড়িত, যথেচ্ছাচারময়, কুৎসিত সংসার-চিত্র যথাযথরূপে অঙ্কিত করিয়া—পরোক্ষভাবে মানবকে কল্যাণের অভিমুখে প্রেরণ করেন।

প্রথমোক্ত রস-সাহিত্য ভাবতান্ত্রিক, অর্থাৎ Idealistic; দ্বিতীয়টি Realistic—বস্তু-তান্ত্রিক। এই বস্তু-তন্ত্রতা আবার

দুইভাগে বিভক্ত: (ক) চরিত্রের কতকগুলি সাধারণ দোষ-গুণের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া কেহ কেহ সেই নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর আদর্শ অর্থাৎ type চিত্রিত করেন; (খ) কেহ কেহ অবস্থা-বিশেষে বিশিষ্টভাবে পরিপুষ্ট individual বা স্বতন্ত্র ব্যষ্টি-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

কিন্তু প্রতিভা প্রভাবে চিত্রিত স্বতন্ত্র চরিত্র (individual) যতই চিত্তহারী হউক, তাহা নাটকের উপযোগী নহে। ঔপন্যাসিক তাঁহার সৃষ্ট স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা ব্যষ্টি-চরিত্রের আঁক্-বাঁক্, কোণ-কানাচ্ সবই বিস্তীর্ণ বর্ণনায় পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন,—নাট্যকারের সে সুযোগ নাই,—কেননা নাট্যকার নেপথ্যবাসী। এই কারণে বিষয়-নির্ব্বাচনে নাট্যকারকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে হয়। যে চেহারা সহজে চেনা যায়, প্রতিভাশালী নাট্যকার তাহাই লোক-সমক্ষে ধারণ করেন। অপরিচিতের সহিত মানুষের সহজে সহানুভূতি হয় না; কিন্তু সহানুভূতি আকর্ষণের উপরেই রস-সাহিত্যের সকল সাফল্য নির্ভর করে। যেমন একটি দীপশিখা হইতে অনুরূপ শিখা জ্বলে, ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়,— কল্পনার কুহকে কবি ও ভাবগ্রাহীর চিত্ত তেমনই শূন্যে-শূন্যে আলিঙ্গন করিয়া একভাবাপন্ন হইয়া উঠে। প্রতিভাশালী কবি স্বীয় সংস্কার, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-বলে যে রসচ্ছবি অঙ্কিত করেন,—তদ্দর্শনে দর্শক বা পাঠকের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ভাবমূর্ত্তি জাগিয়া উঠে; সে আত্মহারা হইয়া আপন মানসচিত্র দেখিতে দেখিতে হাসিয়া কাঁদিয়া বিস্ময়ে বিভোর হয়। দৈবশক্তি ব্যতীত এ ছবি আঁকা যায় না। কবি শিক্ষায় গঠিত হন না, সিদ্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। প্রতিভার রসনা বাণীর পবিত্র আসন। কবির

হৃদয়তন্ত্রী লইয়া যন্ত্রিরূপে যখন বাণী বীণাবাদন করেন, তাহাই নির্ম্মল রসধারারূপে প্রবাহিত হইয়া ভুবন প্লাবন করে,—মানব নির্ম্মল আনন্দ ও নিঃস্বার্থ সুখভোগ করিয়া চরিতার্থ হয়।

মানব-হৃদয় দেব-দানবের দ্বন্দ্বভূমি। তাহার মুষ্টি-পরিমিত হৃৎপিণ্ডের উপর সুরাসুরে—সদসতে নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। কখন্ দেবতার স্বর্গ দানবের বিলাসভূমি হয়, সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা আসে, সয়তানের কুমন্ত্রণায় বিহিত ভোগ ত্যাগ করিয়া কখন্ মানব নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে, কেমন করিয়া সুপ্ত রিপুসকল—নিদ্রিত পিশাচদল জাগিয়া উঠে, কবে কোন্ ঘটনা-বায়ু-চালিত ক্ষুদ্র বীজ চিত্তক্ষেত্রে পতিত হইয়া কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়, কেবল প্রজ্ঞাচক্ষু প্রতিভার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই তাহা সূক্ষ্মরূপে লক্ষ্য করিতে সমর্থ। প্রতিভা দৈবশক্তিশালিনী। মানব-মনের অব্যক্ত ভাব, ঘটনার অস্পষ্ট গতি, কার্য্যকারণের অদৃশ্য শৃঙ্খল কবির তৃতীয় নয়নের সমক্ষে আত্মগোপন করিতে পারে না। এই জন্যই রস-সাহিত্যের আলোচনা প্রকৃত জীবনগ্রন্থ-পাঠের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু কবির শিক্ষা নীতিপাঠের নীতির ন্যায় সূত্রাকারে নিবদ্ধ নহে। তাঁহার অলিখিত, অব্যক্ত নীতিভাবের উচ্ছ্বাস রসের অমিয়ধারায় হৃদয়কে নিষিক্ত করে। তাহা চাণক্য-শ্লোকের মত স্মৃতির কোটরগত করিয়া রাখিবার বস্তু নহে; তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সামগ্রী। শিক্ষাদান রস-সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু শিক্ষালাভ তদালোচনার অবশ্যম্ভাবী ফল। এইজন্য বোধ করি, ভারতে মোক্ষপথ-প্রদর্শক বেদ-বেদান্তাদির পর, রস-সাহিত্যে পুরাণের এত আদর। বৃহৎ ব্যোম-বৃত্তান্ত হইতে জীবাণু পর্য্যন্ত বাহ্য-

প্রকৃতির যে সকল নিগূঢ়-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, মানবের হৃদয়-রহস্য তদপেক্ষা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। এই হৃদয়-রহস্য রস-সাহিত্যের বিষয়ীভূত। বিজ্ঞান মানবের অশেষ কল্যাণ-সাধন করে সত্য, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর রস-সাহিত্য তাহার বুভুক্ষু আত্মার পুষ্টিকর অন্ন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিয়া উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্য মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গঠনে সহায়তা করে। কেবল তাহাই নহে, উচ্চাঙ্গের রস মুক্তি-পথেরও প্রদর্শক; শাস্ত্রও স্বীকার করিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" ভাব-রসে সেই পরম রস-বিগ্রহের সাধনাই রসের চরম পরিণতি। রস-সাহিত্যের আধিপত্য মানবের হৃদয়ের উপর—এইজন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়া মানুষ কবিকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্ত্তমান বিশ্বে এত জগদ্‌বরেণ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক থাকিতে সাধারণ জন-হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সমধিক।

যাহা চিরকল্যাণময়, চিরসত্য এবং চিরসুন্দরের অভিমুখে আকর্ষণ করে, সেরূপ রস-সাহিত্য-পাঠে মানবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। অন্যথা নিরন্তর নিরুদ্দেশ্য রসোচ্ছ্বাসে মনের ভাব-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। হৃদয় স্বাস্থ্য হারাইয়া দুর্ব্বল এবং ব্যাবহারিক জগতের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়ে। যাহা কল্যাণকর তাহাই মহা অকল্যাণ সাধন করে। যে অস্ত্রে শত্রুনাশ হয়, তাহাই আত্মহত্যার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারে। আলোক অন্ধকার দূর করে, আবার ঘরে আগুনও দেয়।

বঙ্গদেশ আজকাল দৃশ্যকাব্যজাতীয় রস-সাহিত্যে প্লাবিত। কথা-সাহিত্যের ত কথাই নাই। রস-সাহিত্য-সৃষ্টি যে কিরূপ

একাগ্র ধ্যান, একনিষ্ঠ সাধনা ও যত্নসঞ্চিত অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, তাহা যদি সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বিস্তর পণ্ডশ্রম নিবারিত হইত। পটুয়া যে প্রাণহীন চিত্র আঁকে, অথবা কুম্ভকার যে মাটির পুত্তলী গঠন করে, তাহাতেও যদি রীতিমত শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সজীব রসমূর্ত্তি সৃষ্টি করা যে কত কঠিন, তাহা আপনা-আপনি না বুঝিলে বুঝান দুষ্কর। শুধু আমাদের দেশে নয়, অনেক স্থানেই সাহিত্যক্ষেত্রে লেখনীর পরিবর্ত্তে হল-চালনা হয়। অধিক মন্থনে অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহলই উঠে। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ যথার্থ রস-সাহিত্য-রচয়িতা ছিলেন। বর্ত্তমান দুই চারিজন প্রতিভাশালী লেখককে সে গৌরবের আসন দিয়া অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ঋষির কার্য্য এখন কৃষিকার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ হইয়া রস-লীলার চরম অভিনয় করিয়া রসপিপাসু ভাবুকবৃন্দকে পরমানন্দের আভাস দিয়াছেন।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সহিত একদিন রাসলীলার আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি ভোর হইয়া গেল। প্রভাতে বলিলেন, 'আজ তোমারও সুপ্রভাত, আমারও সুপ্রভাত। তুমি বিশ্বাস কর, এ সব সত্যি? সেথা তরু-লতা আজও কৃষ্ণ-কথা কয়?—পাখী কৃষ্ণ-গাথা গায়?—বাতাসে বাঁশীর স্বর শোনা যায়?—যমুনা আনন্দে নৃত্য করে?—"জয় বৃন্দাবনমে কুসুমকাননমে ভ্রমরা হরি-গুণ গাওয়ে জি!" এই জন্যেই ঠাকুর বৃন্দাবনে গিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রজে সবই সেই আছে, কৃষ্ণ রে কেবল তোকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি নি!" বিশ্বাস কর

আর না কর, দেব-গুরু-প্রসাদে, অলৌকিক অনুভূতি-বলে তদ্ভাবে ভাবিত হ'লে সবই উপলব্ধি হয়।'

রসের সৃষ্টি ও পুষ্টি-সাধনে গিরিশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ শক্তি ছিল। বলিতেন, 'নাটকে আমার আদর্শ শেক্সপীয়ার, কিন্তু আমি মাছিমারা কেরানি নই। তিনি প্রায় সব উচ্চাঙ্গের নাটকের সূত্রপাত করেছেন এক-একটি সমস্যা নিয়ে। আমি আগে নায়ক-চরিত্র কল্পনা করি। তারপর ঘটনা, অবস্থা-সংস্থান (situation) প্রভৃতির চিন্তা; এই সব হ'তেই রসের উদ্ভব।'

'মানবের হৃদয়-কন্দর রসের জন্মভূমি আর অশ্রু তার প্রস্রবণ।'

'সকল রসেরই চরম পরিণতি প্রেমে এবং বিরহই প্রেমের চরম অভিব্যক্তি।'

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'মিলনান্ত নাটক (Comedy) আনন্দপ্রদ হইলেও করুণ-রসাশ্রিত নাটক (Tragedy) অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ।'

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন—"Drama is life presented in action."

কর্ম্মক্ষেত্রে মানব আপনার শুভাশুভ আচরণে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই নাটকের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচ্যাচার্য্যগণেরও এই একই মত—"প্রত্যক্ষ-নেতৃচরিতো রসভাব-সমুজ্জ্বলঃ।"

নাটকের লক্ষ্য চরিত্রের বিকাশ। মানুষ সংসারে ও সমাজে আপনাকে আপনি সাধ্যমত সংযত করিয়া রাখে, কিন্তু কতক্ষণ? সে স্বতন্ত্র হইয়াও কোন এক অদৃশ্য দৈবশক্তির

অধীন। যখন প্রকৃতির প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, রিপুর দুরন্ত আবেগ, সংযমের বাঁধকে বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং বাহিরের বাধায় বাধায় প্রবলতর হইয়া উঠে, চরিত্র তখনই নাটকীয় বিকাশের উপযোগী। ঘটনাচক্রে মানব এমন বিষম সমস্যায় পতিত হয় যে, তাহার একটিমাত্র পদক্ষেপে সমস্ত জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এই প্রথম পদক্ষেপেই নাটকের সূচনা। সমগ্র নাটক সেই একটি মুহূর্ত্তের ইতিহাস।

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফল অলঙ্ঘনীয়। কার্য্য এবং কারণ দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা। মানবের কোন কর্ম্মই নিরুদ্দেশ্য নহে। শুভাশুভ আচরণে সে আপনার পরিণাম আপনি ডাকিয়া আনে। দৃশ্যকাব্যের কবি সংসারের এই ছবি চিত্রিত করেন। জটিল সমস্যায় সঙ্কল্পে-বিকল্পে মনের হেলা-দোলা, উভয়সঙ্কটে অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনের সন্ধিস্থলে পথ-নির্ব্বাচন, সংশয়ে নিশ্চয়-নিরূপণ. দ্বিধায় কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা—অবস্থায় এবং চরিত্রে এইরূপ দ্বন্দ্ব-সৃষ্টিই নাটকের মজ্জাগত প্রাণ। আশায়-নিরাশায়, ভয়ে-ভরসায় হর্ষে-বিমর্ষে অপূর্ব্ব ছায়ালোক-সম্পাতে, অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, পুরুষকারের প্রচেষ্টায়, দৈবের নির্ব্বন্ধে, বিচিত্র ছন্দে নাটকীয় গল্পের বিকাশ। ঘটনার অনুকূল ও প্রতিকূল আচরণে নাটকীয় গল্পের সৃষ্টি। অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় রসের পুষ্টি। প্রাচীন যুগে দেশ-কাল-ঘটনার সামঞ্জস্য ও পারম্পর্য্য-রক্ষা দৃশ্যকাব্য-রচনার অলঙ্ঘনীয় বিধি ছিল। কিন্তু এখন কার্য্য-কারণের ধারাবাহিকতায় ও আখ্যানবস্তুর একতানতায় দর্শকের চিত্তে ভাব ও রসের ছবি অঙ্কিত করাই নাট্যকলার মুখ্য লক্ষ্য।

যে ঘটনা কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে, যে কার্য্য স্বেচ্ছাপ্রসূত, আয়াস-সাধ্য বা চেষ্টা-সাপেক্ষ নয়, অথবা অবাধে আপনার পরিণাম প্রসব করে, যে চরিত্র দোষে-গুণে নয়, যাহাতে ঘাত-প্রতিঘাত ও উন্মাদনা নাই, তাহা দৃশ্যকাব্যের অনুপযোগী। কবিত্বে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্র-চিত্রে বিপরীত ও বিসদৃশ সমাবেশ করিয়া নাট্যকার দর্শকের কৌতূহল, কল্পনা ও সহানুভূতি উত্তেজিত করেন। তখন রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় নকল আসলের সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া উঠে এবং সভ্যের সংসারে যে নগ্নচিত্র সাধারণতঃ দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে না, কবিত্বের প্রভাবে, কল্পনার পরিচ্ছদে রঙ্গমঞ্চে তাহাই সুন্দরতর প্রতীয়মান হয়।

দর্শকের মনে কৌতূহল উদ্দীপন ও সহানুভূতি সৃষ্টি নাট্যকারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ভাব (Emotion), রাগ (Passion) ও রসের (Sentiment) সন্নিবেশ করিয়া নাট্যকার নায়ক-নায়িকা-চরিত্র এরূপ অপূর্ব্ব ও বিচিত্রভাবে অনুরঞ্জিত করেন যে, দর্শকমণ্ডলী তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলীরূপে পরিণত হয়। রৌদ্র, বীর, হাস্য, করুণ, শৃঙ্গার, ভক্তি, বাৎসল্য প্রভৃতি রসে প্রকৃষ্ট অধিকার না থাকিলে কেহ নাটক লিখিবার অধিকারী হয় না; কেননা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে সাধারণতঃ এই কয়টি রসই প্রচলিত। ভারতবাসীর হৃদয় এই সকল রসে বিশিষ্টভাবে বিচলিত হয়।

বহুগুণসমন্বিত নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি—সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য-রচনার ধারা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবে এ দেশের রুচি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন কখন কখন রাবণের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ কুৎসিত প্রকৃতিও নাটকে নায়কের স্থান অধিকার করে।

এরূপ স্থলে দর্শকের মনে কৌতূহল উদ্দীপন, সহানুভূতি সৃষ্টি ও রসের পুষ্টিসাধন করিবার নিমিত্ত নাট্যকার একটি অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করেন। পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রে তাহাকে Dramatic Hedging বলে। বহুদোষাধার প্রকৃতিতে একটি গুণ সন্নিবেশ করিয়া এরূপ নায়ক-চরিত্র অঙ্কিত হয়। গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটকে ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়—মোহিনীমোহনের দুহিতা-বাৎসল্য। মোহিনী বন্ধুদ্রোহী, কুশীদগ্রাহী, পাষণ্ড, দুর্ব্বৃত্ত, দুরাচার; ব্যভিচার তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, পরের অনিষ্টসাধন তাহার নিত্যকর্ম্ম; সর্ব্বদা সুযোগাভিলাষী; পত্নী "তাঁহার বাঁদী, দাসী, আস্‌বাব।" বলিদান নাটকের রূপচাঁদ মিত্র তাহার কাছে সাধু। কেবল এই দুহিতা-বাৎসল্যই তাহার একমাত্র আকর্ষণ।

হারানিধির আখ্যান-বস্তু—মোহিনীমোহন ধনী, হরিশ ছা-পোষা গৃহস্থ। বাল্যকাল হইতে দু'জনে বিশেষ বন্ধুত্ব। অনেক সঙ্কট থেকে হরিশ মোহিনীকে রক্ষা করেছে। সেই মোহিনী কৌশল করিয়া হরিশের পৈতৃক ভিটা কিনিয়া লইল। বন্ধুমোহে অন্ধ হরিশের চক্ষু যখন খুলিল, তখন আর আত্মরক্ষার আইনসঙ্গত কোন বৈধ উপায় নাই। গিরিশ এই নাটকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সংসারে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিয়া চলা কর্ত্তব্য, অন্যথা নানা রূপে ক্ষতি ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়।

গিরিশের পিতা নীলকমল বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। উইলে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে নাবালক পুত্রদিগের অছি নিযুক্ত করিয়া উইলের সঙ্গে একখানি খাতা রাখিয়া গিয়াছিলেন। গিরিশ বলিতেন, 'তাতে তাঁর বিষয়ের উপর

কতকগুলি সম্ভাবিত আক্রমণ-সম্বন্ধে আলোচনা আর সে সব ব্যাপার উপস্থিত হ'লে, তার কি ব্যবস্থা করতে হবে, তাও লেখা ছিল। সে সব নোট না থাক্‌লে হয়ত আমাদের অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা পোহা'তে হ'ত।'

এই সাংসারিক বিচক্ষণতা কবি উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং 'হারানিধি' নাটকে তাহা প্রতিপন্ন করিতেও ভুলেন নাই। আত্মীয়-স্বজনের সনির্ব্বন্ধ নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধু-মোহে অন্ধ হরিশ মোহিনীর ঋণের জামিনস্বরূপে ভদ্রাসন-বাটী হারাইয়া বৃথা আক্ষেপ করিতেছে—

"আমার দোষ নয়, কার দোষ? আমার স্বর্ণ-প্রতিমা পরিবার, তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল। আমার ইন্দ্রজিতের মত ছেলে, তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল। পোড়াকপালী মেয়েটা, তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল। অখদ্যে অবদ্যে ভাইটে, যে আমা বই জানে না, যে কুকুরের মতন আমার পেছনে পেছনে ফেরে, তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল। যে অনাথ স্কুলের ছেলেরা আমার বাড়ী খেয়ে পড়্‌তে যায়, তাদের মুখ চাওয়া উচিত ছিল। আমার আপনার মনুষ্যত্বের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। আমার দোষ নয়? আপনি দৈন্য-দীন হলেম, স্ত্রীকে পথে বসালেম, মেয়েকে রাঁধুনী করলেম, আবার বল্‌ছ—'অধীর হচ্ছ কেন?' কই অধীর! আমি খুব ধীর! এখনও চণ্ডালকে (বিশ্বাসঘাতক বন্ধু মোহিনীকে) গুলি করি নি; আত্মহত্যা করি নি; তোমার (স্ত্রীর) মাথায় লাঠি মারি নি! হায় হায়! যেন ছায়াবাজী! হায় হায়, কি হ'ল! নীলমাধব (পুত্র) মানুষ

হবে, আমি পেন্‌সন্ নেব, তোমায় নিয়ে—মেয়েটাকে নিয়ে কাশীতে গে বাস করব। আমার সব দিক্ জ্বল-জ্বলাট হ'য়ে উঠ্‌ল! বেশ হয়েছে, নির্ব্বোধের উপযুক্ত সাজা হয়েছে! বড় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের উপযুক্ত ফল পেয়েছি।" (হারানিধি, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

হরিশের শেষ কথাটি 'হারানিধি' নাটকের আর একটি প্রতিপাদ্য বিষয়—ধনি-দরিদ্রে সৌহৃদ্য হয় না।

হরিশ ছা-পোষা গৃহস্থ হ'লেও, বহুগুণ-সম্পন্ন। তিনি দরিদ্র বালকদিগকে অন্নদান করেন, আত্মীয়-বৎসল, পরোপকারী, পণ্ডিত। কিন্তু এই পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে মোহিনী তাঁহাকে উপহাস করিতেছে—'কে বলে তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তুমি মূর্খ! তুমি কথামালাও পড় নি। বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল, সারস বা'র করেছিল। তুমি কি জান না, সারস বাঘের মুখ থেকে মুখ বা'র ক'রে এনেছিল, এই ঢের?—" (হারানিধি, প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)

নাট্যকার হরিশকে বহুগুণসম্পন্ন আদর্শ গৃহিরূপে গঠন করিয়া একটি দোষ-সংযোগে নাটকীয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহার মোহিনী-সম্বন্ধে প্রীতি নয়—মোহ। কথায় বলে—'যা রয়-সয়, সেই ভাল'। হরিশ এক স্থলে বলিতেছেন—"আমি অন্ধ—আমি কারুর কথা শুনি নি। যে মোহিনীকে ঘুণাক্ষরে নিন্দা করেছে, তাকে আমি মারতে গিয়েছি। ...বোধ করি মোহিনী চ'লে গেলে আমি বুক পেতে দিতে পারতুম্।" (হারানিধি, প্রথম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

গিরিশ তাঁহার নায়ক-চরিত্র মোহিনীর প্রকৃতিতে যেমন একটি গুণ, প্রতিনায়ক হরিশের চরিত্রে তেমন এই একটি

দোষ মোহান্ধ দুর্ব্বলতার—সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহাও Dramatic Hedging.

হরিশের মত এইরূপ দুর্ব্বল, মোহান্ধ, সৌহৃদ্যে অতি-মাত্রায় অন্ধ-বিশ্বাসী চরিত্র একটি মাত্র আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। যাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মপথে—সদ্ভাবে গৃহার সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে সারা জীবন নিরুদ্বেগে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়, তাঁহারা ভ্রান্ত। দুর্দ্দিন যে কোন্ ছিদ্র দিয়া দৃঢ় দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহার আজন্মসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ঈশ্বর-নির্ভরতা, মনুষ্যত্ব, ধৈর্য্য—সব নয়-ছয় করিয়া দেয়, কে বলিতে পারে! বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় হরিশ সবই হারাইলেন। গৃহিণী হৈমবতী যখন হরিশকে ধৈর্য্য ধরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মিনতি করিতেছেন, হরিশ বলিতেছেন,—"আমি খুব ধীর! এখনও চণ্ডালকে গুলি করি নি; আত্মহত্যা করি নি—"

গৃহলক্ষ্মী নাটকে মন্মথের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—"কুৎসিত চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া,...কি যন্ত্রণাদায়ক, তা তুমি বুঝ্‌তে পারবে না।" (গৃহলক্ষ্মী, পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক)

হরিশ এখন সেই যন্ত্রণায় অধীর। অসৎ চিন্তা মস্তিষ্কে একবার স্থান পাইলে হরিশের মত উৎপীড়িত অবস্থায় তাহার প্রভাব দমন করা দুষ্কর। "এখনও চণ্ডালকে গুলি করি নি"—পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রে ইহা অনাগতের ইঙ্গিত বা নাটকীয় পূর্ব্বাভাস (Dramatic Foreshadowing)।

অবস্থার উৎপীড়নে আত্মহারা—দিশাহারা হরিশ এখন আপনার উপদেশ আপনি ভুলিয়াছেন। হৈমবতী স্মরণ

করাইয়া দিলেন—"তোমার মুখেই শুনেছি যে, সংসার পরীক্ষার স্থল। এতে যে চিরদিন সুদিন আশা করবে, আশা নিষ্ফল হবে। সুদিনের পর কুদিন, কুদিনের পর সুদিন—পৃথিবীর এই নিয়ম।" (হারানিধি, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

তাঁহার "ইন্দ্রজিতের মত ছেলে" নীলমাধব তাঁহাকে কত সান্ত্বনা দিল—"বাবা, যদি সর্ব্বস্ব গিয়ে থাকে, আমি ত আছি—আমাকে ত মানুষ করেছেন। এতদিন আপনি সংসারের ভার নিয়েছিলেন এখন সংসার আমায় দিন।...আমি পিতা মাতার সেবা অবশ্যই করতে পারব। ঈশ্বর আমায় সাহায্য করবেন।" (হারানিধি, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

হরিশ ইহার উত্তর দিলেন—"কোথায় ঈশ্বর?...ঈশ্বর নেই। এ দৈত্যের সংসার।" (হারানিধি, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

হরিশের মনে মোহিনীকে গুলি করার চিন্তা ক্রমেই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে। বলিতেছেন—"আমার এই সর্ব্বনাশ করলি—তোর কি সর্ব্বনাশ হবে না? তোর কি সর্ব্বনাশ হবে না? দেখি দেখি!" (১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক) অতঃপর আরও দু'একটি ঘটনায় হরিশ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না।

একে অনভ্যস্ত হস্ত, তাহাতে অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক উত্তেজনা, হরিশের গুলিনিক্ষেপ যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে, বিচিত্র কি!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, ব্যর্থকাম প্রতিহিংসা অনেক স্থলে আত্মদ্রোহিতায় বিকৃত—রূপান্তরিত হয়। Homicidal mania হইতে Suicidal mania জাগিয়া উঠে।

কিন্তু হরিশের আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পও সিদ্ধ হইল না। ঘটনা-স্রোত তখন বিপরীত দিকে ফিরিয়াছে।

ঐকান্তিক দুহিতা-বৎসল মোহিনীর কন্যা হেমাঙ্গিনী জীবন-সঙ্কট পীড়ায় শয্যা-শায়িনী। মোহিনী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য পাগল, ডাক্তারকে বলিতেছে—"আমার গলা কেটে দেবো, আমার বিষয়-আশয় যা আছে সব দেবো, আমার হেমাকে বাঁচাও।" (৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

কিন্তু এখনও মোহিনীর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এক দিকে দুহিতার চিন্তা—"হেমাকে কি ক'রে বাঁচাবো" -অন্য দিকে তখনই ভাবিতেছে—"কি ক'রে জব্দ করবো,...কি ক'রে জব্দ করবো!...লুঠ করাবো, খুন্ করাবো...কাট্‌বো, মারবো, না হয় ফাঁসা যাব।" (৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

মোহিনীর মনের ভাব ফিরিল—নীলমাধবের সাধুতায়। হরিশের পৈতৃক ভিটা-সম্বন্ধে যে একরার ও কনভেয়ান্স্ (conveyance) শত্রুর চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রে তাহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক অপহৃত হয়, সেগুলি নীলমাধব-কর্ত্তৃক পুনরর্পিত হইলে ঘটনার গতি ভিন্ন দিকে ফিরিয়া যায়।

'হারানিধি' নাটকের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে, এখনও বিস্তর কথা বলিতে হয়। নাটকের একটা দিক্ মাত্র দেখান হইল।

'হারানিধি' যখন রচিত হয়, তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স্ ছেচল্লিশ বৎসর। ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে 'প্রফুল্ল' নাটক রচিত হইয়াছিল।

প্রফুল্ল নাটক করুণরসাশ্রিত। দুর্জ্জয় বিষয়লিপ্সা ইহার নাট্যপ্রসঙ্গ (Theme)। দৈব ও পুরুষকার-সংযোগে ইহার আখ্যানবস্তুর (Plot) উদ্ভব।

চরিত্রের আচরণে, উক্তিতে, তাহার সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজন—শত্রু-মিত্রের আলোচনায়, মন্তব্যপ্রকাশে, সুনিপুণ, সুকৌশলী নাট্যকার সে চরিত্রের আভাস প্রদান করেন।

'প্রফুল্ল' নাটক একান্নবর্ত্তী পরিবারের ইতিহাস। জ্যেষ্ঠ যোগেশ ত্রিশ বৎসর কঠোর পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। এখন একটু অবসাদ আসিয়াছে। সে অবসন্নতার প্রতিষেধকরূপে যোগেশ পরিমিত মাত্রায় সুরা সেবন করিয়া থাকেন। যোগেশ-সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রী জ্ঞানদা বলিতেছে—"তোমার সব গুণ ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!"

উত্তরে যোগেশ সুরার দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করিলেন—"এ কি জানো, বিষ বল বিষ—অমৃত বল অমৃত।"

জ্ঞানদা তথাপি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—"ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।"

ইহা প্রতীচ্য মতে "নাটকীয় পূর্ব্বাভাস" (Foreshadowing)।

উত্তরে যোগেশ জ্ঞানদাকে বলিলেন—"পাগল!" (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

কিন্তু নিজে পাগল হইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটিল না। তাঁহার পানাসক্তির পরিণতি হইল পানোন্মত্ততায় (Drink-mania)।

এই দৃশ্যেই সংবাদ আসিল, রিইউনিয়ান্ ব্যাঙ্ক (Reunion Bank) বাতি জ্বালিয়াছে। এই ব্যাঙ্কে তাঁহার জীবনের উপার্জ্জন গচ্ছিত ছিল। এই আকস্মিক আঘাত যোগেশ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বনাশের সূচনা হইল।

আবার অদৃষ্টের পরিহাস! যিনি সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন —মধ্যম সহোদর রমেশ—শঙ্কিতা জ্ঞানদা তাঁহাকেই আহ্বান করিলেন, "ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির ক'রে এস, সর্ব্বনাশ হ'ল।" প্রতীচ্যমতে ইহা Dramatic Irony (প্রাচ্যমতে—পতাকাস্থান)।

মধ্যম রমেশ অ্যাটর্নি। তাহার গর্ভধারিণী বলিতেছেন, "বেটা ত নয়, আমার পেটের কণ্টক!" (৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক)।

জ্ঞানদা বলিতেছে—"সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা। রামায়ণে শুনেছিলেম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখ্‌তো না। সেই এসে কি জন্মেছে? এ কারুর নয়!" (৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

যোগেশ বলিতেছেন "ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল করেছিল! কি অবিচার! —কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান করতে পারতে! সুরেশকে জেলে দাও! যেদোর গলায় পা দাও! আমার জন্যে ভেবো না, আমি মদ নিয়েই থাক্‌বো।" (২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

প্রতীচ্যমতে ইহা "নাটকীয় সংবিধান" (Dramatic Preparation)।

জ্যেষ্ঠের উক্তিতে স্বীয় দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত পাইয়া রমেশ বলল, "কি মাতলামো কচ্চো!"

কিন্তু সকল দুরভিসন্ধি-সাধনের পূর্ব্বে রমেশ আত্মসমর্থন করিয়া রাখিয়াছে—

"যাতে পরের অপকার, তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তার পরে বাপের

বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি-শত্রু। এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকানো চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার ভাবি নি। আজই হ'ক, কালই হ'ক, মর্টগেজ সই ক'রে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্ট্রীর—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়; জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে।...” (১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

যোগেশ কর্ম্মী। পুরুষকারের সার্থকতাই বুঝিতেন। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে দৈবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার হৃদয়ভঙ্গ হইল। বলিতেছেন—

“আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠানো হয় না। চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা!—”

ছোট ভাই সুরেশকেও বলিতেছেন “নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা কোরো না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিছু না,—কিছু না! ঠেকে শিখেছি!... খালি জমাট নেশা চলুক্।” (১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

তারপর যোগেশের উক্তিমত সকল ঘটনাই ঘটিল,—বাড়ী শ্মশান, সুরেশের জেল, যোগেশের পুত্র যাদবকে হত্যার চেষ্টা। পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলায় ইহাকেও বলে “নাটকীয় সংবিধান” (Dramatic Preparation)।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব-সম্মিলন-ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয়। এই নিমিত্ত তাঁহার নাটকীয় আখ্যানবস্তুর সৃষ্টিতে সময়ে সময়ে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা-কৌশলের আবির্ভাব দেখা যায়। তদুপরি তাঁহার দৃশ্যকাব্যসমূহে প্রাচ্য নাট্যকলা-কৌশলেরও বহুল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের মতে নাটক পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি—এই পঞ্চ সন্ধি।

'প্রফুল্ল' নাটকের সূত্রপাতেই দেখিতে পাওয়া যায়—লক্ষ্মীর হস্তান্তর। অনতিপরেই অর্দ্ধোন্মাদ মদন ঘোষ বংশরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন—"বংশটা লোপ হ'ল।" (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)—ইহাই নাটকীয় বীজ। বিষয়-লিপ্সা নাটকের নাট্যপ্রসঙ্গ (Theme)।

পঞ্চ সন্ধি নাটকীয় গল্প-বিকাশের পাঁচটী স্তর মাত্র। যাঁহার দ্বারা নাট্যপ্রসঙ্গ ও ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনিই প্রকৃত পক্ষে নাটকের নায়ক, এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই পঞ্চ সন্ধির অবতারণা। প্রথম স্তরে (মুখ)—বীজ বপন ও ঘটনার উৎপত্তি—ইহাই মুখসন্ধি। দ্বিতীয় (প্রতিমুখ)—প্রতিকূল অবস্থার প্রথম অবতারণা। ঈষৎ লক্ষিত ও অলক্ষিত ভাবে বস্তুভাগের অগ্রগতি। তৃতীয় (গর্ভসন্ধি)—অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্ঘর্ষ। চতুর্থ (বিমর্ষ)—বিঘ্ন সমাগম ও অতিক্রম। পঞ্চম (উপসংহৃতি)—পরিণাম।

'প্রফুল্ল' নাটকের প্রথমাঙ্কে বীজ বপন ও ঘটনার সূচনা অর্থাৎ উদ্যোগপর্ব্ব। রিইউনিয়ান ব্যাঙ্ক ফেল এবং যোগেশচন্দ্রের ক্রমশঃ অধোগতি-প্রাপ্তি—এই নাটকের মুখসন্ধি।

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রতিমুখ—প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা। রিইউনিয়ান ব্যাঙ্কে সম্ভাবিত শুভ সূচনা এবং পুনর্জীবন লাভ। রমেশ সংবাদ পাইল—"The Bank may recover"—ব্যাঙ্ক সাম্‌লাইতে পারে। ব্যাঙ্ক সাম্‌লাইলে এবং যোগেশের তাহা কর্ণগোচর হইলে রমেশের দুর্জ্জয় বিষয়লিপ্সার প্রতিবন্ধক।

দ্বিতীয় সন্ধির আর একটি অঙ্গ—বিন্দু, অর্থাৎ অবান্তর ঘটনায় প্রতিপাদ্য ঘটনার সঙ্গতি-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিলে বস্তুভাগের অবিচ্ছিন্নতা সম্পাদন। মদন ঘোষকে লইয়া সুরেশ প্রভৃতির আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া মূল বস্তুর অগ্রগতি—ইহার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় অঙ্কে—গর্ভসন্ধি, অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল-সজ্বর্ষ। ব্যাঙ্ক সামলাইয়াছে। রমেশের নামে যোগেশ যে টাকা জমা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য ব্যাঙ্কে যাইতেছেন। কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধে যোগেশের ব্যাঙ্কে যাওয়া হইল না, পথে ব্যাপারীরা 'জোচ্চোর' বলিল, তাহার পর এক মাতালনী আসিয়া গাহিল—

"মা, তোর এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে—
দেখা দাও না একটি বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস্ ধেয়ে,
কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লি নি চেয়ে,
আমিও মাত্‌বো মদে—
মা ব'লে ডাক্‌বো না আর॥"।

পরে সেও যোগেশকে 'জোচ্চোর' বলিল। অভিমানী যোগেশ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—"আর কারুর মুখ চাব না, যার যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি করবো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্ —কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে?…যে পথে চলেছি, সেই পথেই যাব।" (প্রফুল্ল—৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক) অতঃপর যোগেশ পুনরায় সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ অঙ্কে ও পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক অবধি—বিমর্ষ সন্ধি—বিঘ্ন সমাগম ও অতিক্রম।—রমেশের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনিবার চেষ্টা, এবং যোগেশচন্দ্রের বিশ্বস্ত সরকার ও মকদ্দমার প্রধান উদ্যোগী পীতাম্বরকে মিথ্যা ফৌজদারী চার্জ্জে হাজতবদ্ধ করিয়া রমেশ সমাগত বিঘ্ন অতিক্রম করিল।

রমেশের ষড়যন্ত্রের সহায়ক কাঙালী রমেশকে বলিতেছে, "এখন নিশ্চিন্তি, রামরাজ্য ভোগ করুন।" (৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

অর্দ্ধোন্মাদ মদন ঘোষের দ্বারা দলিলের বাক্স চুরি করান হইয়াছে। জাল যোগেশ সাজিয়ে সত্য যোগেশকে ওয়ারেন্ট (warrant) ধরানো হইয়াছে। এখন যোগেশের পুত্র যাদবকে হত্যা করিতে পারিলেই সব "আপদ্ চোকে।" রমেশের চক্রান্ত ও চেষ্টায় যাদবও ধরা পড়িল। কাঙালীচরণ বলিল, "বাবু, এক জন খেটে খুটে বিষয় করলে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন।" (৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

পঞ্চমাঙ্কের অবশিষ্ট কয়টি গর্ভাঙ্ক—উপসংহৃতি।

নায়ক-নায়িকা-চরিত্রের যেখানে চরম বিকাশ, অপরিবর্ত্তনীয় পরিণতি, ঘটনার যেখানে সম্পূর্ণ বিরাম—অভিনব সূত্রপাতের সম্ভাবনাবিহীন, সেইখানেই নাটকের উপসংহার।

রমেশ ও প্রফুল্ল স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার বিচিত্র সম্মিলন। প্রফুল্ল-চরিত্র এক দিকে যেমন বজ্রাদপি কঠোর, আর একদিকে তেমনি কুসুমাদপি মৃদু। কিন্তু তাহার চরিত্রে এই বিপরীত ও বিসদৃশ গুণ বয়স্ বা কালের স্বধর্ম্ম--ক্রম-পরিণতি নহে,—তাহার প্রকৃতিগত অবস্থা এবং ঘটনায় বিকাশ প্রাপ্ত। কেন-না, নাটকীয় ঘটনার স্থিতিকাল বা পরিমিত সময় প্রায় ছয় মাস। যে সরলা, স্বভাব-কোমলা প্রফুল্ল মাতৃস্বরূপিণী শ্বশ্রূর নিকট হইতে ডাল-বাটা খাইবার জন্য নিত্য আব্দার করে, ছয় মাস পরে নাটকীয় ঘটনার অবসানে রমেশ যখন তাহাকে শাসাইল--"ভাল চাস্ ত দূর হ, নইলে তোরে খুন করবো।"—তখন সেই স্বভাব-কোমলা ভীরু বালিকা তেজস্বিনী বীররমণীর মত উত্তর দিল—

"তুমি কি মনে কর. আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ, নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য করতে দেব?...তুমি কখনই এ শিশুকে বধ করতে পারবে না।" (৫ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

অন্য এক স্থলে মদন ঘোষকে বলিতেছে—

"মদন দাদা, যা করেছ, তার আর উপায় নেই। আমায় ব'লে দাও—যেদো কোথায়। আমি তাকে কোলে নে বসি;

দেখি, কোন্ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয় ?" (৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

দুষ্টবুদ্ধিবলে ও কূট-কৌশলে রমেশ সকলকে পরাজয় করিয়াছে— কেবল এই ধর্ম্মভীরু সরলা সহজ-শুভ-বুদ্ধিশালিনী বালিকাকে বশীভূত করিতে পারে নাই।

প্রফুল্লের হত্যা আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নহে। যখন হইতে সে দুষ্ক্রিয়ান্বিত, দুর্ম্মতি পতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে, তখনই সে আপনার মৃত্যুকে আপনি ডাকিয়া আনিয়াছে। তদ্ভিন্ন তাহার নির্ম্মল অন্তরও তাহাকে সে ঘটনার ইঙ্গিত করিয়াছিল। প্রফুল্ল বলিতেছে—"আমি আর বাঁচ্বো না, আমার কোথায় ভরাডুবি হয়েছে !" (৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

নির্ম্মল অন্তরে কখন কখন ভাবী অমঙ্গলের ছায়াপাত হয়, পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন---ইহা Presentiment.

'মার্চ্চেণ্ট অফ্ ভিনিস্' (Merchant of Venice) নাটকে মহাকবি শেক্সপীয়ার এন্‌টোনিয়োর (Antonio) মুখে এইরূপ ভাবী অশুভের আভাস দিয়াছেন—"I know not why I am so sad." এ অহেতু উক্তি ভাবী ঘটনার ছায়াপাত। 'সীতার বনবাস' নাটকে প্রথম অঙ্কে, প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রথম ছত্রেই দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি—

"নাহি জানি, ভাই রে লক্ষ্মণ,
এই কি রে রাজ্যসুখ !"

এ স্থলে একটি কথা ভাবিবার আছে—কি পাপে বা কি অপরাধে—নাট্যকার প্রফুল্লের উপর মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রায় সকল নাটকই আধ্যাত্মিক, নৈতিক ধর্ম্ম-

ভাবাপন্ন। তবে কোন্ বিচারে এই নির্ম্মল কোমল কুসুমের উপর বজ্রাঘাত ?

সংসারে বিচার অনেক প্রকার আছে। ন্যায়বিচার, ধর্ম্মের বিচার, আদালতের বিচার, সামাজিক বিচার, বিধি-বিচার, লোকবিচার প্রভৃতি। কিন্তু কবির বা কাব্যের বিচার (Poetic Justice) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাব্যকলা ও ধর্ম্ম-নীতির সংমিশ্রণে যে বিচার দর্শকের মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করে, তাহাই কাব্যের বিচার। জীবনে কখন কখন এমন সকল ঘটনা ঘটে, যখন জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা, মনে হয় মৃত্যুই মঙ্গল - দণ্ড নয় পুরস্কার। রমেশের সহিত পুনর্মিলন ঘটিলেই প্রফুল্লের কঠোরতম দণ্ড হইত। এই জন্যই নিষ্পাপা নিরপরাধা ডেস্‌ডিমোনা (Desdemona) মৃত্যু-শয়নে, কর্ডেলিয়া (Cordelia) উদ্বন্ধনে। আত্মবিসর্জ্জনই এরূপ মহৎ জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

প্রফুল্ল জীবিত থাকিলে যে নরপিশাচ স্বামীর সহিত তাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত, আসন্ন মৃত্যুমুখে প্রফুল্ল তাহার চিত্র দিয়াছে। বলিতেছে—

"শুনেছি তুমি বিদ্বান্; আমি অবলা স্ত্রীলোক—আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখ ভোগ করবে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হয়েছেন, ছোট ভাই (সুরেশ) কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায়। এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে; তোমার জীবনে কি সুখ, আমি ত বুঝ্‌তে পারছি নি?" (৫ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

এরূপ স্বামীর কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভ—মুক্তি এবং মৃত্যুই তার একমাত্র দ্বার।

দৈবের নির্ব্বন্ধে, কুচক্রীর কুচক্রে, সর্ব্বনাশিনী, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-হারিণী সুরার উন্মত্ত প্রভাবে সদাশয়, সত্যনিষ্ঠ যোগেশচন্দ্রের জীবন যেন যাদুবলে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ধন, যশ, লজ্জা, মান, আত্মসম্মান, মায়া-মমতা, আশা-ভরসা—সব যায়—স্মৃতি যায় না। জীবন-শ্মশানে রাবণের চিতার ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। দুর্ভাগ্য তাঁহার জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই স্মৃতির আলোকে যোগেশ কখন কখন স্ব-স্বরূপকে অন্বেষণ করেন -

"যেয়ো না, শোন, একটা কথা শোন,—এক জন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়ুতো; একটি ছেলে ছিল, তারে কোলে নিয়ে চুমু খেতো। দিন গেল — দিন ফুরুল, আবার এক জন যোগেশ হ'ল। বলে যোগেশ. যোগেশ কিনা—কে জানে! এ যোগেশ কে, তা জান? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালালো, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চলে এল। ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে। প্রাণে একটু লাগ্‌লো না। কারুকে সে চায় না। বল্‌তে পারো, কোন্ যোগেশ আমি? সে কি এ?" (৪র্থ অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক)

তারপর চরম দৃশ্যে যোগেশ প্রবেশ করিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই যে রমেশ! দেখ্‌ছ—দেখ্‌ছ, দেখ! মরবার সময়ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ!" (৫ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

যোগেশ যে চিত্রের প্রতি রমেশের অন্তর্দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, অনতিপূর্ব্বে প্রফুল্ল তাহা অঙ্কিত করিয়া বলিয়াছে—

"এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে; তোমার জীবনে কি সুখ!"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"Men may live fools, but fools they cannot die"— জীবিতকালে মানুষ যতই মোহান্ধ থাকুক, মৃত্যু তার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেয়।

'বলিদান' নাটক যখন রচিত হয়, গিরিশচন্দ্রের বয়স্ তখন চৌষট্টি বৎসর; সংসার, লোকচরিত্র ও নাট্যকলায় পরিপক্ক অভিজ্ঞতা। জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া গিরিশ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সংসারে সুখের আশ দুঃখের উপহাস মাত্র, পরিপূর্ণ আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ উপবাস করে। পুরুষকারের প্রাণান্তিক প্রয়াস নিয়তির ফাঁস ছিন্ন করিতে পারে না।

'বলিদান' নাটকের বিষয়-বস্তু—নিয়তির দুর্ব্বার গতি। প্রসঙ্গ—বরপণ।

এ নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর পীড়নে মানুষ যত নিপীড়িত হয়, নিষ্পেষিত চন্দনের ন্যায় তাহার চরিত্র ততই সৌরভ ও গৌরব বিস্তার করে।

এক 'হারানিধি' ব্যতীত গিরিশচন্দ্রের সকল সামাজিক নাটকই করুণরসাত্মক (Tragedy); 'বলিদান' নাটকে কিশোর ও জ্যোতির মিলন-শঙ্খ বাজিয়াছে শ্মশানে।

যে সংসার কাম-কাঞ্চনের মৃগয়াক্ষেত্র; স্বার্থপরতা যেখানে কার্য্যের প্রেরণা; আসক্তি কর্ম্মের উদ্দীপনা; শঠতা, কপটতা যথায় সিদ্ধির উপাদান; যে সংসারে সত্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ। মিথ্যা শ্বাস-বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছন্দ-গতি; প্রবঞ্চনা দক্ষতার প্রমাণ; সরলতা, সহানুভূতি, দয়া—দুর্ব্বলতা; দ্বেষ, হিংসা, নির্য্যাতন,

অনিষ্ট-সাধন যেখানে আনন্দের উপকরণ; স্বেচ্ছাচার যে সংসারে পৌরুষ; প্রত্যয়—নিরাশ্রয়;—সে সংসারে ঘটনার স্বাভাবিক গতিই ট্র্যাজিডির দিকে—কমেডি (Comedy) দৈব-ঘটিত (accident)।

গিরিশচন্দ্র যখন পরবর্ত্তী সামাজিক নাটক 'শাস্তি কি শান্তি' রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বর্ষ। হর্ষ, সংসার-সুখের স্পর্শ, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহার জীবনে চির-তিরোহিত। শমনের পুনঃ পুনঃ অভিসারে তাঁহার বাসভবন শ্মশান! গৃহের প্রতি কক্ষ—স্মৃতির সমাধি-মন্দির! আপনার ছায়াকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই জন্যই গিরিশচন্দ্রের রচনার মাঝে মাঝে আমরা তাঁহার জীবন-স্মৃতির সাক্ষাৎ পাই। 'মায়াবসান' নাটকে কালীকিঙ্কর বলিতেছেন—

"আমার আলাদা মহল, দাদার আলাদা মহল, দেখে এস প'ড়ে রয়েছে—কেউ নাই!—কেউ নাই! একা আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি! আর কেউ নাই, কেউ নাই!" (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

"এখন আর চোখে জল নাই, শুষ্ক, নীরস! শাখাশূন্য বজ্রাহত তরুর ন্যায় হয়েছি।" (ঐ, ঐ)

অপর এক স্থলে—

"আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় অনেকবার বসেছি, অনেকবার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি, অনেক সয়েছি, অনেক দেখেছি, আর দেখ্‌বার সাধ নাই!" (ঐ, ঐ)

গিরিশ বলিতেন, 'শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে পত্নীহীন হওয়া যে কি শোচনীয়, তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি।'

গিরিশের প্রথমা পত্নীর পরলোক হয়, যখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন। কবি এ দুর্জ্জয় শোক সংবরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন কবিতা রচনায়—

"But for the unquiet heart and brain
A use in measured language lies."

কিন্তু হায়, তাহা সহজে হইবার নয়! এই "In Memoriam" গ্রন্থে Tennyson আবার বলিয়াছেন—

"But who shall so forecast the years
And find in loss a gain to match?
Or reach a hand thro' time to catch
The far-off interest of tears."

গিরিশ মনকে বুঝাইতে লাগিলেন—

"পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ-বিয়োগ নিত্য ছেলেখেলা প্রায়।
একত্রে যখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায়!
একত্র হইলে ভাবে রহিবে আলোকে।
বিপরীত দেখে কিন্তু পলকে পলকে!"

বয়সের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী তাঁহাকে যে নিবিড় দাম্পত্য-বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, সে বন্ধন ছিন্ন করিতে কবির জীবন-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। তখন তাঁহার বয়স্ পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

একদিকে আবগারি-মহল ইজারা, অন্যদিকে দুরন্ত শোকে দিশাহারা। ইহার একচ্ছত্র আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ

করিতে না পারিলে, জীবনের ব্রত উদযাপন হইবে না। গিরিশ শুনিয়াছিলেন, গণিতবিদ্যার অনুশীলনে চিত্ত স্থির হয়। তাই তিনি অঙ্ক-শাস্ত্রের আলোচনায় রত হইলেন।

অনুশীলনে গিরিশচন্দ্রের চঞ্চল চিত্ত স্থির হইল। দ্বিতীয় পত্নী-বিয়োগের পর নট-কবির প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল'। তখন তাঁহার শোক স্বায়ত্তীকৃত—শাণিত ছুরিকা হৃত-ধার। এই নাটকে নায়ক বলিতেছেন—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি করবো? গেল, তা কি করবো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা-হা! গেল, যাক্! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!" (৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

দ্বিতীয় পত্নী-বিয়োগ চরম শোক হইলেও জন্ম হ'তেই মাতৃ-স্তন্যে বঞ্চিত কবির চিরজীবন গভীর বেদনাময়।

'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটকে রাজা বাতুলকে বলিতেছেন—

"দেখি আশ্চর্য্য স্বভাব তব
নিজ দুখে কর উপহাস।"

বাতুল উত্তর দিল—

"মহারাজের দুঃখের সঙ্গে নূতন আলাপ, আমার অনেক দিনের প্রণয়, দুটো একটা ঠাট্টা-বোট্‌কেরা চলে।" (১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক)

কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবলেই 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে পাগল বলিতেছে—

"অবশ্য আপনার মত অত দুঃখ পাই নি; কিন্তু বোধ হয়, চেষ্টা করলে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়। আমার হয়েছে, হরমণির হয়েছে, আপনারও হবে।" (৫ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক)

প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত নাট্যকার কোন চরিত্রই অঙ্কিত করেন না। নানারূপ অবস্থায় তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হয় মাত্র। গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে যে সকল সতী-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, এই সাধ্বী, সতী, প্রণয়িণী পত্নীর আত্মত্যাগী প্রেম তাহার মূল।

মানবের সঙ্কীর্ণ হৃদয় অসীম—অপরিমেয় ভগবৎ-প্রেম ধারণা করিতে অক্ষম। পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ আদর্শ না দেখিলে,—এই অহেতু করুণাসিন্ধু, অপার প্রেম-বারিধির অসীম কৃপা, অপরিমেয় ভালবাসা না পাইলে,—সংসারের রুদ্রমূর্ত্তির সহিত আজন্ম-পরিচিত গিরিশ ঈশ্বরের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন না।

গুরুর নিকট কোন গুরুতর অপরাধে অযাচিত মার্জ্জনা লাভ করিয়া গিরিশ একদিন বলিয়াছিলেন, 'না চাহিতে যিনি ক্ষমা করেন, তাঁর কাছে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষাই বা কি, আর প্রায়শ্চিত্তই বা কি? অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই ত তিনি মার্জ্জনা করেছেন। নইলে প্রতিপদে অপরাধী দুর্ব্বল মানুষের সাধ্য কি যে এক দণ্ড স্থির থাকে!'

'মায়াবসান' নাটকে রঙ্গিণী বলিতেছে—"পাপের দণ্ড—মার্জ্জনা নাই? তবে ত মানব-দেহ-ধারণ মহাবিপদ! যদি মার্জ্জনা না থাকে, কোথায় যাব—কোথায় দাঁড়াব! আমি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ্‌চি, এ জীবন কেবল কার্য্যপ্রবাহ, সকল কার্য্যই কলুষিত! এর যদি দণ্ড হয়, যদি মার্জ্জনা না থাকে, এ কার্য্যফল যদি ভোগ হয়, তা হ'লে ত অনন্ত কালেও নিস্তার নাই!" (৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

"মার্জ্জনাই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব!" (ঐ, ঐ)

গিরিশচন্দ্রের রচনা অনুশীলন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে কবির অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়লাভের পর। তাঁহার যৌবন এবং তৎপরবর্ত্তী কালের রচিত কয়েকখানি সঙ্গীত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। যৌবনের রচনায় কেবল বহির্জগতের বর্ণনা—বহির্দৃষ্টি—

"পোহাল যামিনী বহে ধীর সমীরণ,
ধূসরবরণ শশী তারকাহীন গগন ॥
গাহিছে বিহগকুল,
ফোটে নানাবিধ ফুল,
কাননে শোভা অতুল, আকুল মধুপগণ ॥
বিনোদে বিদায় দিয়ে
কাতরা কুমুদী হিয়ে
জলে মুখ লুকাইয়ে করিছে রোদন ॥
কমল বিমল নীরে
ভাসিছে হাসিছে ধীরে,
পুন পাইবে মিহিরে হবে সুখ সম্মিলন ॥"

পরবর্ত্তী কালের রচনা—

"জুটল অলি ফুটল কত ফুল—
দোলে হায় ধীর পবনে সৌরভে আকুল।
ঝর ঝর ঝরছে শিশির
যেন সোনায় গাঁথা মালা মতির,
পাখীর গানে প্রাণে হানে তীর,
আকাশে উষা হাসে জলে কমলকুল ॥"

ভক্তি, ভালবাসা ও বিরহের সঙ্গীতে গিরিশের অপরিসীম কৃতিত্ব ছিল। কিন্তু এখানেও এই একই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রথম যুগের বর্ণনায় কেবল বহির্দৃষ্টি—

"এই কিরে কপালে ছিল
কেঁদে কেঁদে দিন বহিল।
করি যার উপাসনা
সেই করে প্রতারণা,
নারী হয়ে কি লাঞ্ছনা বিধি বাদ সাধিল॥
বসন ভূষণ ধন,
সব হ'ল অকারণ,
দিয়ে সুখ বিসর্জ্জন পোড়া প্রাণ রহিল॥"

পরবর্ত্তী রচনা—

"সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়।
মন প্রাণ সমর্পণে এতই কি সে দোষী হয়।
ছি-ছি সখী কি লাঞ্ছনা,
কেন স'ব এ যন্ত্রণা,
জীবন থাকিতে সখী যাতনা যাবার নয়।
ছি-ছি সখী ছার বাসনা,
তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে তবু পথ চেয়ে রয়॥"

পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের রচিত দুইখানি ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত তুলনা করিলেও এ পার্থক্য প্রতীয়মান হইবে।

পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালে রচিত শ্যামাসঙ্গীত—

"ঘোররূপা ঘনবরণা, শবাসনা দিগ্-বসনা,
নগনা, মগনা, রুধির-দশনা,
ত্রিনয়না তারা তার দীন জনে
মুক্তকেশী, শিশু শশী শিরে
ভৈরবী ভীমা দনুজ-রুধিরে—
তপন-কিরণ চরণ শোভন,
অট্টহাসি দামিনী-দলন,
পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাথেই ডাকিনী সনে॥"

"হের হরমনোমোহিনা কে বলে রে কালো মেয়ে।
আমার মায়ের রূপে জগৎ আলো—
চোখ থাকে ত দেখ্ না চেয়ে।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী,
অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী—
ভ্রমর ভ্রমে কমল-ভ্রমে
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে॥"

সঙ্গীত-রচনায়, বিশেষতঃ নাট্যসঙ্গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই নাট্যকারের এক একটি গানে এক একটি চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। 'মায়াতরু' তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য। ইহাতে দুইটি বনদেবী-চরিত্র চিত্রিত

আছে। তন্মধ্যে ফুল-হাসি—ইহার কল্পনা বিমান-বিহারিণী—বলিতেছে—

"না জানি সাধের প্রাণে
কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি।
আমি ত প্রাণ দেব না, প্রাণ নেব না.
আপন প্রাণে ভালবাসি ॥
চপলা করে খেলা, ধ'রে গলা,
বেড়াই সদাই অভিলাষী।
তারা তুলে পরব চুলে,
করব চুরি চাঁদের হাসি ॥"

অপরটি ফুল-ধূলা--ইহার কল্পনা এই সাগরাম্বরা, শ্যাম-কলেবরা, নদীনির্ঝরশালিনী, কুসুমমালিনী ধরণী-বিলাসিনী—বলিতেছে—

"নির্ঝর শীতল, শীতল ফুলদল,
শীতল চন্দ্রমা-হাসি।
কিরণ মাখিয়ে, ফুলদলে ঢাকিয়ে,
ধীর সমীরে ভাসি ॥
মুক্ত-চিকুর—মৃদুল সমীর,
হেলা দোলা - নয়ন বিভোলা,
চাঁদ পানে চাই, চাঁদ পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে সুধারাশি ॥"

কবির কোন কোন সঙ্গীতে অপূর্ব্ব নাটকীয় ব্যঞ্জনা ধ্বনিত দেখা যায়।

"অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো—
নাহি হেরি কুসুমমঞ্জরী লো।
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে
মনোব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরোনীর নেহারি লো॥"

সীতার বনবাসে এ সঙ্গীত অযোধ্যা ও রামচন্দ্রের ভাবী অবস্থার আভাস দিতেছে।

কঠোর সাধনারত বুদ্ধদেবকে মিতাচার অবলম্বনের ইঙ্গিত করিতে কবি দেববালাগণের মুখে এই গীতটি যোজনা করিয়াছেন—

"আমার এ সাধের বীণে
যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে
উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি,
তারে শত ধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে,
টানে ছেঁড়ে কোমল তার॥"

এখানে ধর্ম্মের অনুশাসন-বাক্য—"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু" (গীতা—৬।১৭)—সুললিত ভাব, ভাষা ও ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হইয়াছে।

কাব্য ও রসসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ব্যঞ্জনা। গিরিশচন্দ্রের নাটকের পাত্র-পাত্রীগণের কথোপকথনেও ব্যঞ্জনার অভাব নাই।

গিরিশচন্দ্রের মাতৃ-চরিত্রের প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিলেন তাঁহার গর্ভধারিণী। এই আদর্শ হইতে তিনি অনেক মাতৃ-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'জনা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনা—মাতা, প্রয়োজন হইলে পতিকে পদদলিত করিয়া যে মা সন্তানকে বরাভয় প্রদর্শন করেন, সেই মা—ভারতের আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি—রণরঙ্গিণী জগজ্জননী।

যে মা বলেন—

"মা ব'লে ডাকিলে,
দিগম্বরে যাই সখি ভুলে"

(কমলে কামিনী, অ' ৩, গ' ৫)

সতী-রূপিণী যে মা বলেন—

"বর তবে দেহ, ভোলানাথ,
ত্রিশূল আঘাত তারে কভু না করিবে,
মা ব'লে যে ডাকিবে আমারে॥"

(দক্ষ-যজ্ঞ, অ' ৩, গ' ১)

অপরিমিত আমোদে আসক্ত হইয়া গিরিশ অবশেষে বুঝিয়াছিলেন, উচ্চ রসের অনুশীলন ও উপভোগেই পরমানন্দ। এ নিমিত্ত তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইত—অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতায়।

এই অন্তর্দৃষ্টিবলে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটকগুলি ও পৌরাণিক নাট্যরচনার অধিকাংশের বস্তু-স্থাপনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের শেষোক্ত শ্রেণীর নাট্যরচনার ধারা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনায় ক্বচিৎ কোথাও মহাকবি শেক্স্‌পীয়ারের সহিত ভাবগত সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা অনুকরণ বা অনুলিপি নহে। কুহকী কবিকল্পনা কখন কখন এরূপ বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে। মহাকবি কাশীদাস দুর্য্যোধন-দুহিতা লক্ষ্মণার রূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"নির্ধূমাগ্নি কিংবা যেন রচিত বিদ্যুতে।
বালসূর্য্য উদয় হইল পূর্ব্বভিতে॥"

জুলিয়েট্‌কে দেখিয়াও রোমিও বলিতেছে—

"But, soft! what light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the Sun!"

—Shakespeare, *Romeo and Juliet*, Act II, Scene 2.

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, জাতীয় ভাবাপন্ন না হইলে উচ্চাঙ্গের জাতীয় নাটক লেখা যায় না। জাতীয় কবি জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত। জাতীয় কবির হৃদয় জাতির হৃদয়-তন্ত্রীর সহিত একসুরে বাঁধা, সমভাবে স্পন্দিত। ধর্ম্ম হিন্দুর মর্ম্মগত। তাহার মনোবৃত্তিসকল পৌরাণিক ভাবে গঠিত এবং ব্যাস-বাল্মীকি-প্রতিষ্ঠিত উচ্চাদর্শে পরিচালিত। বহুবর্ষের বিজাতীয় সঙ্ঘর্ষ ও সংস্পর্শ সত্ত্বেও এখনও এই আর্য্যভূমে সতীর আদর্শ

সীতা-সাবিত্রী, রাজত্বের আদর্শ রাম-রাজত্ব। সর্ব্বগুণের আধার, সর্ব্বরসের আকর শ্রীকৃষ্ণ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাব-তরঙ্গিত রসের সাগর।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য জগতে অধিকাংশ রস-সাহিত্য তত্তজ্জাতীয় পুরাণ অবলম্বনে রচিত; কেন না, চরিত্রের এরূপ উচ্চ কল্পনা, ভাবের এরূপ বিচিত্র বিলাস, রসের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ একমাত্র পৌরাণিক প্রসঙ্গেই চিত্রিত হইয়াছে। অলীক ও অলৌকিক ভাবিয়া আমরা যখন ঐ সকল প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করি, তখন ভুলিয়া যাই যে, পুরাণান্তর্গত সকল উচ্চ চরিত্রই রসের চিত্র এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কদাচ রসসৃষ্টি হইতেই পারে না।

আর্য্য আলঙ্কারিকগণের অনুমোদিত সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন না হইলেও গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসকলই প্রকৃত নাটক। কেবল ঐ সকল পৌরাণিক প্রসঙ্গ বর্ত্তমান রুচিসঙ্গত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্থলে স্থলে পরিবর্ত্তিত, মার্জ্জিত, বর্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে।

অভিনয়ের উপযোগী নাটক লিখিতে হইলে নাট্যকারকে বহুবিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। সাময়িক রুচি, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের আকৃতি, প্রকৃতি, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অনেক বিষয়ে বাঁধা পড়িতে হয়। অভিনয় করিবার লোকাভাবে তাঁহার বিমান-বিহারিণী কল্পনাকে সব সময় পর্য্যাপ্ত প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কোন কবি লিখিয়াছেন—"Even stronger Shakespeare felt for man alone."—অর্থাৎ, তাঁহার চিত্রিত নারী-চরিত্র, পুরুষ-চরিত্রের মত প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাহার কারণ, সে সময় নারীর ভূমিকা

পুরুষে অভিনয় করিত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ অভিনেতা ছিলেন Burbage-এর ন্যায় শক্তিশালী নট।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পুষ্টি-সাধনের জন্য গিরিশচন্দ্র যে সকল নাট্যচিত্র বা দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিকে 'নাটক' বলা যায় না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন, বহুপ্রসিদ্ধ লোকচরিত্র অবলম্বনে যে সকল দৃশ্যকাব্য রচিত হয়, তাহাই 'নাটক'—"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ।" এ লক্ষণানুসারে তাঁহার পৌরাণিক ও ইতিহাসমূলক দৃশ্যকাব্য-সকলই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক।

সংস্কৃতমতে—স্বকপোলকল্পিত, সুবিস্তৃত ও বহুচরিত্রযুক্ত নাট্যচিত্রসকল 'প্রকরণ'—"ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।" 'হারানিধি', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি এই 'প্রকরণ'-শ্রেণীভুক্ত। রসচিত্র-রচনায় গিরিশচন্দ্রের কল্পনা বহুপ্রসূতি, বিচিত্রভাবময়ী, অনন্তব্যাপিনী। কি 'মনি-হরণ', 'নন্দদুলাল' প্রভৃতির ন্যায় পৌরাণিক রসচিত্রে, কি 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতির মত সামাজিক শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ রঙ্গনাট্যে, কি জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রেম-ভক্তির অন্তরতম প্রদেশে, কি ঐতিহাসিক-রাজনীতি-ক্ষেত্রে, তাঁহার কল্পনা ছিল সর্ব্বত্র অবাধগতি—মুক্তদ্বার। তাঁহার 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'বুদ্ধদেব-চরিত', 'অশোক', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'করমেতি বাঈ' নাটকে কবি জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রেম-ভক্তির যে সমুজ্জ্বল রসচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র হিন্দুর দেশে হিন্দু কবির দ্বারাই সম্ভব। পাশ্চাত্ত্য জগতের নট-নাট্যকার রঙ্গমঞ্চ-রবি মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার—"ইউরোপে স্বাধীন জাতি, রাখে যাঁরে মাথা পাতি,"

—লোকচরিত্রে যাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা, তিনিও তাঁহার কোন নাটকে জ্ঞান-ভক্তির এরূপ চরম বিকাশ, প্রেম-ভক্তির এরূপ উচ্চতম উন্মাদনা—উচ্ছ্বাস দেখান নাই। অনুকূল ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তাপ-জল-বায়ু-সহায়ে ফলে-ফুলে শোভমান হয়। মহাকবি গিরিশচন্দ্র মহাকবি শেক্স্পীয়ারকে তাঁহার আদর্শরূপে স্থানে স্থানে অনুকরণ করিলেও তাঁহার রচনা মৌলিকতা-বর্জ্জিত ছিল না। তাঁহার স্বকল্পিত নাটকের কথা ছাড়িয়া দিলেও যে সকল নাটকে তিনি শেক্স্পীয়ারের অনুসরণ করিয়াছেন, সেগুলিতেও তাঁহার নিজস্ব দান যথেষ্ট আছে। মহাকবি শেক্স্পীয়ার ছিলেন কর্ম্মের অনুরাগী, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছিলেন ধর্ম্মের। মহাকবি শেক্স্পীয়ার কোন একটি সমস্যায় নাটকের সূচনা করিতেন, গিরিশচন্দ্রের অবলম্বন ছিল নায়ক বা নায়িকার চরিত্র। পাশ্চাত্ত্য কবির নাট্য-সমস্যা নৈতিক—ঐহিক, গিরিশচন্দ্রের ছিল পারমার্থিক। শেক্স্পীয়ারের নাটকীয় বিকাশ হইত ঘটনায় চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়া, গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় বিকাশের লক্ষ্য ছিল রসের পুষ্টি। শেক্স্পীয়ার realistic হইয়াও কল্পনা-বিলাসী, গিরিশচন্দ্র ভাব-প্রবণ হইয়াও প্রত্যক্ষবাদী। পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার কোন কোন নাটকে অলৌকিকের অবতারণা করিয়াছেন ; কিন্তু অবস্থাবিশেষে ঘটনার আনুকূল্যে লোকচরিত্রে লোকাতীত ভাবের উদ্দীপনা, আবির্ভাব ও উন্মাদনা প্রদর্শন একমাত্র গিরিশচন্দ্রের জাতিগত, স্বভাবসিদ্ধ অধিকার। ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'।

এ নাটকের আখ্যান-বস্তু 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার রচনারীতি (style), ঘটনা-পরিকল্পনা ও

আখ্যান-বস্তুর পরিচালনা (treatment) সকলই পৌরাণিক। 'বিল্বমঙ্গল' ও 'করমেতি বাঈ' দৃশ্যকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই দুইখানি নাটকেরই আখ্যান-বস্তু 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; তন্মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল'-সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে বলিয়া উহার বিশেষ আলোচনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

যে বয়সে (৪৩ বর্ষ) গিরিশচন্দ্র এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—তখন তাঁহার কবি-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-গৌরব। যশের সৌরভ যোজনগন্ধার ন্যায় দিগন্ত-বিস্তৃত। তখন তিনি সংসারের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। শমনের পুনঃ পুনঃ তীব্র শেলাঘাতে তাঁহার জীবন বিস্বাদ। নাস্তিকতার অবসানে তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। শ্রীগুরুর শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া শান্তির আস্বাদ পাইয়াছেন। তখন রামায়ণ-গ্রন্থাবলী রচিত হইয়া গিয়াছে, 'জনা' এবং 'পাণ্ডবগৌরব' লিখিলেই সমগ্র মহাভারত-গ্রন্থমালা সম্পূর্ণ হয়। তখন 'চৈতন্যলীলা' রচনায় ও অভিনয়ে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ— বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব-সমাজ— মাতিয়া উঠিয়াছেন। 'চৈতন্যলীলা'র আশাতীত সমাদরে পরমোৎসাহিত হইয়া গিরিশ একে একে 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'প্রভাস-যজ্ঞ' ও 'বুদ্ধদেব-চরিত' রচনা করিয়াছেন এবং প্রেম-ভক্তি-রসাত্মক আর একখানি নাটক বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাইবার চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রেম ও ভক্তিময় রচনায় কবির অসামান্য শক্তি ও কৃতিত্ব দর্শনে পুলকিত হইয়া গিরিশের কাছে ভক্ত-বিল্বমঙ্গল-কাহিনী বলিয়াছিলেন; এবং এই নাটকান্তর্গত ভণ্ড-সাধক-চরিত্র স্থানে স্থানে তাহার উক্তি-প্রত্যুক্তি-ভাব-ভঙ্গী-

হুবহু অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

লোকোত্তর পুরুষের অভিনয়-প্রতিভা ছিল যেমন অলোকসামান্য, তেমনি প্রাণময়। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'যদি দেখ্‌তুম কোন গুণে—কোন অংশে ঠাকুর আমার চেয়ে নিকৃষ্ট, আমি তাঁহাকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে পারতুম না।'

বিল্বমঙ্গল প্রেমিক; কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় বারাঙ্গনার রূপ-মোহে মুগ্ধ। পঞ্চাঙ্ক-পরিমিত এই নাটকের সূচনা আদি-রসে, পরিণতি ভগবৎ-প্রেমে। ইহার নায়ক ব্যভিচারী, নায়িকা বারাঙ্গনা।

কথোপকথনচ্ছলে রচিত হইলেও নাটক সাক্ষীর জেরা-জবানবন্দী নয়, ব্যবসায়ের খস্‌ড়া-খতিয়ান নয়, নাটক দৃশ্য-কাব্য—অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকট প্রতিচ্ছবি—রসের চিত্র।

এই নাটকের যবনিকা উঠিতেই আমরা দেখিতে পাই, নাটকের নায়ক বিল্বমঙ্গলের অন্তরে রূপজ মোহের প্রভাব অতিক্রম করিবার নিমিত্ত প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিল্বমঙ্গল বারবনিতা চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী! কিন্তু অতি সুন্দর,—অতি সুন্দর!" বিল্বমঙ্গলের পুনঃ পুনঃ এই 'অতি সুন্দর' উক্তি প্রেমের উক্তি ও আদিরসের অভিব্যক্তি। এই সময় পথে টহলদারেরা গাহিল—

"কি ছার! আর কেন মায়া?
কাঞ্চন কায়া ত রবে না।"

(২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

অতঃপর নদীকূলে গলিত শব-দর্শনে এ সত্যই পৌরাণিক। মানসপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল—

"এই নারী—এরও এই পরিণাম !"

(২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

জীবনের কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে যে মানবের অন্তর্দৃষ্টি উন্মিলিত হয়, তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে বলা যায় না। কিন্তু কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। অন্তরে প্রেম-ভক্তি-সূচনার পূর্ব্বে বিল্বমঙ্গল আপনার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বিবৃত করিতেছেন—

"ছিলি ব্রাহ্মণকুমার,
বেশ্যাদাস নয়নের অনুরোধে,
পিতৃশ্রাদ্ধদিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,
ঘোর নিশা, মহাঝঞ্ঝাবাতে
তরঙ্গের সনে রণ,
র'হিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে।
সর্পে রজ্জুভ্রম—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন,
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার !"

(৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক)

এই দৃশ্যকাব্যে নায়ক-চরিত্র যে ভাবে পরিণাম-পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে—

১ম অঙ্কে—প্রেম ও রূপজ মোহে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

২য় অঙ্কে—নায়কের হৃদয়ে বৈরাগ্য-সঞ্চার ও সংসার-ত্যাগ।

৩য় অঙ্কে—গুরুকৃপা।

৪র্থ অঙ্কে—সাধনা।

৫ম অঙ্কে—সিদ্ধি।

"সে আমাকে তার সর্ব্বস্ব ভেবেছিল; শেষে দেখ্‌লে কালসাপিনী!" (৩।২)

যে আকুল প্রেমতৃষ্ণায় দুরন্ত দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া বিল্বমঙ্গল ভেলাজ্ঞানে গলিত শব, রজ্জুভ্রমে কাল-সর্প অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ নশ্বর জগতে সে প্রেমে প্রতিদান ত দূরের কথা, পরিবর্ত্তে আছে কেবল তিরস্কার আর লাঞ্ছনা। প্রেম-পিপাসায় তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "চিন্তামণি, একটু জল দাও।"

কবি যে এ স্থলে 'জল' বলিতে সাধারণ জল বুঝান নাই, বুঝাইয়াছেন প্রেমপিপাসার্ত্ত বিল্বমঙ্গলের শান্তিদায়ক প্রেমবারি, তাহা বলাই বাহুল্য।

দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে বিল্বমঙ্গলের আজ অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইল—বুঝিলেন যে, রজ্জুভ্রমে যে সর্প-অবলম্বনে তিনি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, ভেলাজ্ঞানে যে শবদেহ আশ্রয় করিয়া তিনি নদীপার হইয়াছেন, তাহাদেরই প্রকৃষ্ট প্রতিরূপ এই নারী—একাধারে বিষধর সর্প এবং প্রাণহীন শব! তখন তাঁহার মনে হইল—

"নশ্বর সংসারে
তবে, হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন?
....
....

কে দেখাবে আলো ?
খুঁজে লব আমার যে জন।” (২।৩)

গিরিশ বলিতেন, ঈশ্বরলাভের জন্য যথার্থ আন্তরিক ব্যাকুলতা উপস্থিত হ’লেই গুরু আবির্ভূত হ’ন। ইহা তাঁহার নিজ জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন তাঁহার হৃদয় নিরতিশয় সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান—দারুণ উদ্বেগাকুল, তখনই তিনি শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলাশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

বিল্বমঙ্গল অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইলে পাগলিনী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল—

“আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ’রে।” (২।৩)

বিল্বমঙ্গল যেমন অসংযত, তেমনি অকপট। তিনি কু বা সু কোনরূপ ভাবের প্রভাবই অতিক্রম করিতে পারেন না। আত্মতৃপ্তির জন্য ঘৃণাশূন্য, নির্ভীক, লজ্জাহীন। তিনি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যখন তাঁহার প্রেমপাত্রী বারবিলাসিনী চিন্তামণির সহিত মিলিত হইলেন, তখন সে তাঁহাকে তিরস্কার করিল—

“তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই। তুমি দড়ী ব’লে সাপ ধর, কাঠ ব’লে পচা মড়া ধর।” (২।৩)

প্রেম ঐশী শক্তি, অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য প্রভাব-সম্পন্ন। মলয়-স্পর্শে বিষবৃক্ষ চন্দনতরুর গুণ-সম্পন্ন হয়; সাপ স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে; বিষ অমৃতে পরিণত হয়। চিন্তামণি-চরিত্রের ইহাই কেন্দ্রগত ভাব। কিন্তু দাঁত থাকিতে যেমন দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না, তেমনই বিল্বমঙ্গল-কর্তৃক

পরিত্যক্ত হইবার পর সে তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিল। তাই বলিতেছে—

"কাঁদ আঁখি,—
কভু কাঁদ নি পরের তরে।
কাঁদ নি তখন,
যবে গুণনিধি চ'লে গেল
অভিমান-ভরে।" (৪।৩)

বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ মর্ম্মাহত হইয়া সংসারে বীতশ্রদ্ধ ও ধর্ম্মপথে ধাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র-পরিবর্ত্তন যেমন উচ্চ অনুরাগে, চিন্তামণির তেমনই অনুশোচনায়।

বিশেষভাবে প্রতি চরিত্র বিশ্লেষণ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মূল কয়েকটি কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতেছে।

এ নাটকের পাগলিনী দাম্পত্য-জীবন আস্বাদন করিবার পূর্ব্বেই বিধবা হইয়াছে। কেনই বা বিবাহ, আর কেনই বা বৈধব্য! পাগলিনী ভবিতব্যের এই বিধান-সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছে, কার্য্য-কারণের কোনই নির্দ্দেশ পায় নাই; এ ত পাগলের বিধান! তাই ভিক্ষুককে সে বলিতেছে—

"আমার পাগল বাবা, পাগ্‌লী আমার মা।" (১।২)

যতক্ষণ সংসারের আকর্ষণ থাকে, ততক্ষণ মন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় না। পাগলিনী-সম্বন্ধে চিন্তামণি বলিতেছে—

"এও সামান্য পাগ্‌লী নয়, একেও দাগা দে ভগবান গৃহত্যাগী করেছে।" (৩।২)

প্রেমে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত বিল্বমঙ্গল যেমন মধুর ভাবের সাধক, দাম্পত্যসুখ-বঞ্চিতা, আত্মীয়-স্বজন-কর্তৃক উৎপীড়িতা পাগলিনীও তেমনি মধুরভাবের সাধিকা। সাধনলব্ধ দৃষ্টিতে সে বিল্বমঙ্গলকে দর্শনমাত্রেই বুঝিয়াছিল যে, তিনিও সমভাবের সাধক। তাই বিল্বমঙ্গলকে তাহার প্রথম সম্ভাষণ—"প্রাণ সই!" (১।৪) দৃদয়

পাগলিনী বাৎসল্য-ভাবে মাতাপিতা বলিয়া জগন্মাতা, জগৎপিতাকে জানিয়াছে, কিন্তু বিবাহ-রাত্রিতে বিধবা হইয়া দাম্পত্যভাবের কোন আস্বাদনই সে পায় নাই। তাই নব-পরিণীতা বধূর মত পতির সহিত মিলিত হইতে লজ্জা তাহার বিষম বাধা। কিন্তু সাধনার প্রথম সূত্র—"ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।"—শ্মশান-ভূমে চিতাপার্শ্বে পাগলিনীকে প্রথম দেখে মনে হয়, সে ঘৃণা-ভয় উভয় ভাবই অতিক্রম করিয়াছে। বাকি মাত্র লজ্জা। তাই সে পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—"লজ্জা করে!" (১।৪)

বিল্বমঙ্গল বহু প্রাচীন কাহিনী। ইহার গল্পাংশ-সৃষ্টির জন্য গিরিশচন্দ্রের কোন কৃতিত্ব নাই। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারও প্রাচীন আখ্যায়িকা ও ইতিহাস প্রভৃতি অবলম্বনে নাটক রচনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'ঘটনার সমাবেশে, চরিত্র-উন্মেষে শেক্‌স্‌পীয়ারের সমকক্ষ কোন নাট্যকারই নাট্যজগতে এখনও আবির্ভূত হ'ন নাই।' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবৃত গল্পের তাৎপর্য্য-গ্রহণে কবির গভীর অভিনিবেশ, পর পর ঘটনার সমাবেশ, চরিত্র-অঙ্কনে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তাঁহার রসসৃষ্টি, ভাব-ভাবুকতা, প্রেম-ভক্তির অবাধ উচ্ছ্বাস—বিল্বমঙ্গল নাটককে জগতের নাট্য-

সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, অতিথি-সৎকারে বণিকের স্বীয় সহধর্ম্মিণী-প্রেরণ এ নাটকের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—বিল্বমঙ্গলের এই ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনিয়াই বণিক্ বুঝিয়াছিল যে, যিনি অকপটে—অসঙ্কোচে আপনার মনের ঘৃণিত দৌর্ব্বল্য ব্যক্ত করিতে পারেন, তাঁহার দ্বারা কোন হেয় কার্য্য সম্ভবে না। তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ। হয়ত ছলনার জন্যই তাঁহার নিকট এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। তাই বিনা দ্বিধায় বিল্বমঙ্গলের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বণিক্ বলিতেছেন—

"মহাশয়, আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি—
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।" (৩।৫)

মহাভারতের যুগে কর্ণও একদিন এইরূপ উৎকট পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন—

"বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন।
তারে কাটি দেহ মাংস, করিব ভক্ষণ॥"
(—কাশীদাস)

অতঃপর বিল্বমঙ্গল স্বহস্তে নিজ নয়নদ্বয় অন্ধ করিয়াছিলেন। এ নয়ন অন্ধ করার তাৎপর্য্য সংসারের উপর যবনিকাপাত। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবার অবসর ও অধিকার এত দিনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই

ইহার পরেই দেখি যে, বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ অন্ধ বিল্বমঙ্গলের পথপ্রদর্শকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অতঃপর বিল্বমঙ্গলের দেবদৃষ্টি উন্মুক্ত। অনেকে দোষ দেন যে, এই বালক-শ্রীকৃষ্ণের অবতারণা এরূপ একখানি অপূর্ব্ব নাটকের একটি বিশিষ্ট দোষ—religious digression; কিন্তু ইহারও উত্তরে বলা চলে—ঐকান্তিকী ভক্তি ও প্রপত্তি যে ভগবান্‌কেও ধরাধামে টানিয়া নামায়—এ চরিত্র তাহারই সূচনা করে মাত্র।)

'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে গিরিশচন্দ্র যতগুলি প্লট সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই এইরূপ রূপান্তরের উদাহরণ। মর্ম্মব্যথায় তাঁহাদের সূচনা এবং পরম শান্তিরসে তাহাদের পরিসমাপ্তি।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'ঘাত-প্রতিঘাতই নাটকের জান।' এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া নাটকের সূচনায় পূর্ব্ব ঘটনা ব্যক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র পরিস্ফুট করিতে হইবে। ঘাত-প্রতিঘাত-সৃষ্টির সুযোগ না থাকিলে তিনি সে সকল চরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইতেন না। তাঁহার করমেতি, বিষাদ, পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত-চরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু 'ভক্তমাল' হইতে আখ্যানবস্তু আহৃত হইলেও চিত্রে-চরিত্রে অনেক নূতন সংযোজনা করিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নবনবোন্মেষশালিনী' শক্তি—প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। চরিত্রে বা ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাত-সৃষ্টির জন্য রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন-প্রদর্শন ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।

ভারতের পশ্চিম-প্রদেশে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য

আছে—মন্ত্রগ্রহণেচ্ছু শিষ্যকে গুরু প্রশ্ন করেন, 'তোমার উপর গুরুঘরের চোট্ কিছু এসেছে ?' 'গুরুঘরের চোট্' অর্থে দৈব-প্রেরিত শাসন —দুর্ঘটনা।

এইরূপ চোট্ না পাইলে যে চরিত্রের রূপান্তর সম্ভব হয় না—বিল্বমঙ্গল ও পাগলিনী উভয়েই তাহার সাক্ষাৎ নিদর্শন।

বিল্বমঙ্গল নাটকে পাগলিনী-চরিত্রে আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। ব্রজাঙ্গনাদের মনোমত পতিলাভ হইয়াছিল ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'পাগলিনীর মনোভাব, তাহার সাধনার প্রতি স্তর আমি গানে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি।' রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রথম আবির্ভাব জগন্মাতার উপর অভিমান লইয়া। মাকে সে প্রসন্ন করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করে নাই। দিন-রাত অশ্রুপাত—

"পর্ব্বত-গুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন।" (১।৪)

মানুষের অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রশক্তি আর কি করিতে পারে! তাই অভিমান-ভরে সে বলিতেছে—

"ও মা, কেমন মা কে জানে!
মা ব'লে মা ডাক্‌ছি কত
বাজে না মা তোর প্রাণে ?
মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর,
লাগে কি না দেখ্‌ব তোমার,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার,
প্রাণ যদি না মানে॥" (১।২)

কিন্তু প্রেম-ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবান্ আর কোন ভাবেরই বশীভূত নহেন। পাগলিনীর প্রেমাশ্রুপাত বিফল হইল না। অবশেষে সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইবার সময় সে বিদায় লইয়া গেল—

"যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদমতলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।" (৪।২)

প্রেমময় ভগবান্ প্রেমিক ভক্তের ব্যাকুলতায় তাহাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। ঘন ঘন বাঁশরী-স্বরে আহ্বান আসিয়া ভক্তের শ্রবণ-বিবরে পশিতেছে। এখন অভিমানের পালা তাঁহার—

"না গেলে সে কেঁদে কেঁদে
চ'লে যাবে মান-ভরে।" (৪।২)

মানব-জীবনে কখন কখন এমন এক একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে তাহার অন্তরের অন্তস্তলে জীবনের সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিল্বমঙ্গলের জীবনে এ সত্য একদিন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ 'বিষাদ' দৃশ্যকাব্যের নায়ক অযোধ্যাধিপতি অলর্কের জীবনে সেই দিন উপস্থিত। এই নাটকে গিরিশ এই পরম সত্য প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অসদুপায়ে কখন সদভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। কেবল এই নাটকে নয়. এই পরীক্ষিত পরম সত্য তাঁহার 'মায়াবসান,' 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি নাটকেও প্রকটিত।

'বিষাদ' নাটকের সূচনা ঘাত-প্রতিঘাতে। অলর্করাজ বারনারী-বিলাসী তাঁহার আর চার সহোদর জননীর উপদেশে বিষ্ণু-সাধন-উদ্দেশ্যে বনবাসী। জ্যেষ্ঠ মাধব বিষয়পঙ্কে নিমগ্ন অলর্কের উদ্ধারকল্পে দৃঢ় প্রযত্ন। অত্যধিক পরিমাণে আমোদ-প্রিয় রাজা অলর্ককে নিত্য নূতন আমোদ যোগাইয়া দেন। মাধবের চক্রান্তে পতিসুখে বঞ্চিতা সরস্বতী মাধবকে মিনতি করিয়া বলিলেন—

"পূর্ণ কর সতীর কামনা,
পতিভিক্ষা মাগি তব পায়।" (১।১)

উত্তরে মাধব বলিলেন—

"আমি শত্রু তব, শুন সুকেশিনি,

দিবস-শর্ব্বরী মনে মনে করি
রাজ্যেশ্বরে কবে করিব ভিখারী—
....
পরিহরি সুন্দর ভবন,
ছেদি প্রণয়-বন্ধন,
পতি তব বনে বনে করিবে ভ্রমণ—

নিত্য আনি বারবিলাসিনী,
যেন পত্নীসনে
কদাচিৎ দেখা নাহি হয়।" (১।১)

এ দিকে রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য রাজ্য টল টল করিতেছে। দুই দিক হইতে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ নরপতি আক্রমণে অগ্রসর।

অলর্কের ভ্রুক্ষেপ নাই। বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অলর্ককে বিজ্ঞাপিত করিলেন। অলর্ক বলিলেন "বিপদ্ বিপদ্ করছ—শুন্‌বে? আমার মা একটি কৌটো দিয়ে গিয়েছেন। .. ..কৌটোটির কি মজা জানো? যদি কখন ভারী বিপদ্ হয়, কৌটোটি খুল্‌ব, আর ফুস্-মন্তরে উড়িয়ে দেব। মার কথা মিথ্যা নয়—জান ত?…গোপালজী তাঁর কাছে কথা ক'য়ে লাড্ডু চাইতেন।" (১।১)

এটি গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক স্মৃতি। তাঁহাদের গৃহ দেবতা শ্রীধর তাঁহার মাতার কাছে কাঁটাল চাহিয়া খাইয়াছিলেন।

বলিয়াছি, অলর্ক অতিমাত্রায় আমোদপ্রিয়, রাজকার্য্য তাঁহার জঞ্জাল। বলিতেছেন—

"এ জঞ্জাল কিবা হেতু মম?" (১।১)

কিন্তু মাধবের চক্রান্তে রমণীর মোহজাল এখনও ছিন্ন করিতে পারেন নাই। মাধবের শিক্ষা-দীক্ষায় বারবিলাসিনী উজ্জ্বলা তাঁহাকে দৃঢ় মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ করিয়াছে। মাধবের কথায় তিনি বুঝিয়াছেন যে, আমোদই স্বর্গ, কিন্তু ক্ষত্রিয়-শোণিত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত, বীর্য্যবল—সাহস তাঁহার জাতিগত সম্পত্তি। অরির সম্মুখে সে পরিচয় প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত। তাই বলিতেছেন—

"সিংহশিশু স্বেচ্ছায় কাননে খেলে,
কিন্তু করী হেরি বিমুখ কি কভু
বিদারিতে মস্তিষ্ক তাহার?
আমি রাজপুত্র—অরি নাহি ডরি।

....

শুন সঙ্কল্প আমার—
মিত্রগণবেষ্টিত আমোদে রব রত
শত্রুশরে শয্যা রচি মুদিব নয়ন।" (১।১)

কাম-কাঞ্চন-মোহ-মুক্তি ও হরিভক্তি এই দৃশ্যকাব্যের আখ্যানবস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চনই প্রকৃত পক্ষে সংসার। সেই সংসারে বীতশ্রদ্ধ না হ'লে মানুষ ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, দৈহিক নিয়মে অতিভোগে ভোগপিপাসার নিবৃত্তি হয়। কখন কখন প্রবৃত্তির কণ্টকিত পথ, সংসারের দুঃসহ দাহন কাহারও কাহারও মোহ দূর করে।

ঘটনা-পরম্পরার দ্বারা অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্য-সন্নিবেশে গিরিশচন্দ্র যে ভাবে এই নাটকের গল্প এবং চরিত্র বিকাশ করিয়াছেন, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

প্রকৃতপক্ষে মাধবই এই নাটকের নায়ক, কেন-না তাহারই প্রচেষ্টায় ইহার ঘটনাবলী উদ্ভাবিত। সে সকলের গতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে। অলর্ক ও সরস্বতী তাহার ফলভোগী মাত্র।

প্রথম অঙ্কে, প্রথম গর্ভাঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, পতিসেবাবঞ্চিতা সরস্বতী মাধবকে মিনতি করিতেছেন—

"দিনান্তে বারেক দরশন
এ জীবনে বাঞ্ছা মাত্র মম
তাহে তুমি নাহি হও বাদী—" (১।১)

মাধব বলিলেন—

"আমি সেই সাধে বাদী।

....

করি প্রাণপণ
কদাচন তব সনে না হয় মিলন—" (১।১)

গিরিশচন্দ্র অতি সুকৌশলে এই স্থলে নাটকের 'বীজ' বপন করিয়াছেন। যেখানে তিনি মাধবের মুখ দিয়া রাজরাণী সরস্বতীকে বলাইয়াছেন –

"দিবস-শর্ব্বরী মনে মনে করি
রাজ্যেশ্বরে কবে করিব ভিখারী—
রাজ্য কবে দিব শত্রুকরে।
পরিহরি সুন্দর ভবন,
ছেদি প্রণয়-বন্ধন,
পতি তব বনে বনে করিবে ভ্রমণ—" (১।১)

—আর্য্য আলঙ্কারিকদিগের মতে এইরূপ দ্ব্যর্থ এবং গূঢ়ার্থবোধক উক্তির নাম 'পতাকাস্থান।' এ উক্তির প্রকৃত অর্থ সংসার-বৈরাগ্য। ইহাই নাটকের 'বীজ'।

ইহার পর মন্ত্রী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে. কনোজপতি অযোধ্যা আক্রমণে আগতপ্রায়।

২য় গর্ভাঙ্কে—বারবিলাসিনী উজ্জ্বলার মোহে ফেলিবার জন্য মাধবের চক্রান্ত।

৩য় গর্ভাঙ্কে—রাজরাণী সরস্বতী মন্ত্রীকে বলিতেছেন—

"মন্ত্রী, রাখ প্রাণ, রাখহ বচন—
দেখাও সে রমণীরতন,
যার প্রেমে মাতি, দিবারাতি
পতি মম ফেরে তার সাথে।
সত্য কহি দাসী হব তার—
দিবানিশি সেবিব তাহার পদ।" (১৩)

সরস্বতীর এই সঙ্কল্পে নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ। আর্য্য আলঙ্কারিকগণ বলেন—ইহা 'মুখসন্ধি'।

২য় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে অলর্ক উজ্জ্বলার কুহকী মায়ায় আবদ্ধ।

২য় গর্ভাঙ্কে—রাজার ভাণ্ডার লুটের জন্য তস্করগণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র।

৩য় গর্ভাঙ্কে—পুরুষের ছদ্মবেশে সরস্বতীর উজ্জ্বলার গৃহে আগমন ও সেবকরূপে আশ্রয়প্রার্থনা। মাধব উজ্জ্বলার গৃহ হইতে বিতাড়িত। ইহাই 'প্রতিমুখসন্ধি'।

৩য় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে—অলর্কের সহিত উজ্জ্বলার প্রণয়-কলহ অলর্ককে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া উজ্জ্বলাকে তাহা প্রদানের ষড়যন্ত্র। ছদ্মবেশী সরস্বতীর উপর উজ্জ্বলার ভালবাসা-সঞ্চার। এ স্থলে আমাদের মহাকবি শেক্স্পীয়ার-রচিত 'Twelfth Night or What You Will' নাটক মনে পড়ে। পুরুষের ছদ্মবেশধারিণী Viola-র উপর Countess Olivia-র অনুরাগ-সঞ্চার স্মরণ হয়।—

"Cesario (ছদ্মবেশী Viola), by the roses
of the spring,
By maidhood, honour, truth and everything,
I love thee so, that, maugre all thy pride,
Nor wit, nor reason, can my passion hide."
(Act III, Scene 1)

৩য় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—উজ্জ্বলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা। উজ্জ্বলাকে বিতাড়িত করিবার মাধব ও মন্ত্রীর পরামর্শ ইহাই 'গর্ভসন্ধি'।

৪র্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে—অলর্ককে হত্যার পরামর্শ। অলর্ক বন্দী। তস্কর-সাহায্যে সরস্বতী-কর্ত্তৃক ভাঙ্পানে অচেতন পতির উদ্ধার। মাধবের মাতৃদত্ত সম্পুটপ্রাপ্তি।

৪র্থ অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে—অলর্কের কাছে সরস্বতীর আত্ম-প্রকাশ। সরস্বতীকে হত্যা। মৃত্যুমুখে রাজা-রাণীর পরিচয় ও মিলন। প্রাচ্যমতে ইহাই 'বিমর্ষসন্ধি'।

৫ম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে—মাধবের আত্মগ্লানি—"হায়, হায়! কি সর্ব্বনাশ করলেম! ভগবান্ আমি অজ্ঞান, আমি জান্‌তেম না, কুকার্য্য-দ্বারা সৎ অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না।" অলর্কের নিকট আত্মপ্রকাশ, তাহাকে মাতৃদত্ত সম্পুটদান।

৫ম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—ছায়াদেহে অলর্কের মাতা ও পত্নী সরস্বতীর আবির্ভাব। রাজমাতার উপদেশ—

"কর বৈরাগ্য আশ্রয়,
সার কর হরির চরণ।"

৫ম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—প্রতিহিংসায় উজ্জ্বলা-কর্ত্তৃক মাধবের বক্ষে ছুরিকাঘাত, পরে সোহাগীকে ধরিয়া নদীবক্ষে ঝাঁপ দিবার সময় বলিল—"আমি তোকে ছাড়ব না, সঙ্গে নেবো, দুজনে কুকার্য্য ক'রে বেড়িয়েছি, চল্, এক সঙ্গে নরকে যাই।" মৃত্যুকালে মাধব বলিলেন,—"মৃত্যুকালে আমার প্রাণে শান্তি এলো। অলর্ক হরি উপাসনা করবে।" সংস্কৃত-মতে ইহাই 'নির্বহণসন্ধি' বা উপসংহার।

দুর্দ্দৈব-দুর্ঘটনার উৎপীড়নে কিরূপে মানবের অন্তঃকরণে সংসার-বৈরাগ্য উদয় হয়, ইহাই এ নাটকের আখ্যানবস্তুর প্রতিপাদ্য। 'বিষাদ' দৃশ্যকাব্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

রামায়ণ অনাগত পুরাণ। ইহার নায়িকা সীতা— সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর দুহিতা। 'সীতার বনবাস' নাটকে গিরিশচন্দ্র বাল্মীকির মুখে বলিয়াছেন—

"নলিনী-মাঝারে
হেরেছি, মা, তোরে বীনাপাণি!" (২।২)

মহাকবি বাল্মীকি যখন এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন যুগপ্রবর্ত্তনে একপাদ সত্য লুপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ত্রেতা-যুগ। আর্য্য ও অনার্য্যে, নর ও রাক্ষসে প্রাধান্য লইয়া প্রবল সঙ্ঘর্ষ। অন্ধকার যেমন আলোকের, বারি যেমন বহ্নির চিরবৈরী, দেবাসুরেও তেমনি চিরদ্বন্দ্ব বিরাজমান। রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতিকে মহাকবি অতিভোগের আদর্শরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি তেমনি ত্যাগের চিত্র। বাস করিতে গেলে রাবণের সোনার লঙ্কা চাই। চড়িবার জন্য পুষ্পক-রথ প্রয়োজন। দেবরাজ তাহার মালা গাঁথিবে। সুধাকর তাহার সুধা যোগাইবে। মহাকাল তাহার অশ্বপাল। এমনই প্রধান প্রধান দেবগণ হেয়—অপকৃষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত। শারীরিক সম্পত্তিও বড় কম নয় দশটা মুণ্ড, বিশখানা হাত। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যেমন ছয়মাস, আহারও তেমনই অপরিমিত: পালে পালে ছাগল, ভেড়া, মহিষ তাহার নস্য। ইহাদের প্রতিপক্ষ—সীতা অনন্ত-ধৈর্য্যশালিনী, সহ্যগুণের আদর্শ; লক্ষ্মণ অনন্তশক্তি-সংযমসম্পন্ন; শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার।

আজ-কাল একটা কথা উঠিয়াছে—Superman—অতি-মানব—মানবাতীত গুণসম্পন্ন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়িল।

মাঠে একটা শূকর চরিতেছিল। একজন প্রশ্ন করিল—'বল দেখি, ওটা কি?' দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, 'ওটা বড়-লোকের বাড়ীর ইঁদুর!' প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'না। ওটা কোন গরীব লোকের বাড়ীর হাতী।' দুইজনে তর্ক-বিতর্ক, তৎপরে কলহ, মুখোমুখি ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয়। শেষে তৃতীয় এক ব্যক্তি মীমাংসা করিয়া দিলেন, 'তোমরা দুজনেই ভ্রান্ত। ওটা ইঁদুরও নয়, হাতীও নয়, ওটা 'পুষ্কর্ণী'।' তর্ক-বিতর্ক-স্থলে প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। অবতার—মানবাতীত গুণসম্পন্ন মানব, অথবা মানব-ভাবাপন্ন ঈশ্বর, অবতার-Superman, কি, Lesser God, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা দুঃসাধ্য, কেন-না ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত। কর্ম্মভূমে দ্বিতীয় রাম, বা দ্বিতীয় কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাহাই হউক, অবতার ঈশ্বর হইলেও সাধারণ মানবের ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে কর্ম্মফল-ভোগী। ইহার পর আরও একটি কথা আছে: ন্যস্ত কর্ম্ম বা অর্পিত ভার সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ হইলে অবতারের আর সে শক্তি থাকে না। তাই রাবণবধ ও সীতার বনবাসের পর রামচন্দ্র শিশু লব-কুশ-দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অর্জ্জুনও গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই।

ব্যাস-বাল্মীকি এই দুই ঋষি-কবি মহাভারত-রামায়ণ রচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে দুঃখই জীবনের চরম অভিজ্ঞতা, মানবের পরম ঐশ্বর্য্য, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, শ্রীভগবানের প্রেমের দান। দুঃখ পরীক্ষা নয়, শিক্ষা নয়—দুঃখ

মহাদীক্ষা—প্রেমময় ভগবানের প্রেমের দান। মহৎ প্রেম মহৎ দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই বৃন্দাবনের চন্দ্র চির অস্তমিত। সীতাবিচ্ছেদে অযোধ্যার রাজভবন চির অন্ধকার। এ নীতি কেবল এ দেশের নয়, পাশ্চাত্ত্যের মহাকবি শেক্স্পীয়ারও তাঁহার সকল শ্রেষ্ঠ দৃশ্যকাব্যে এই সত্যই প্রতিপন্ন এবং প্রচার করিয়াছেন। আবার দুঃখ নিষ্কারণে আসিয়া উপস্থিত হয়—নির্দ্দোষ, নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক নর-নারীর জীবন নিঃশেষে দগ্ধ করে।

"As we draw near to the awful close of *King Lear* or of *Othello* and feel the fibres of our being almost torn asunder, the comfort that comes to us when quiet falls on the desolate scene is the comfort of the sure knowledge that Shakespeare is with us; that he who saw these things felt them as we do, and found in the splendours of courage and love a remedy for despair."—Raleigh.

বিচ্ছেদ প্রেমের পরম বিভূতি, দেবাদিদেব মহাদেবের ভূষণ। আমাদের শিরা-উপশিরা, অন্ত্র-তন্ত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া যে ভস্মাবশেষ পড়িয়া থাকে, তাহাই বিভূতিরূপে বহিরঙ্গে প্রকাশ পায়। বিচ্ছেদ-বেদনাই প্রেমের জীবনরস। যে প্রেম বিরহের তীব্র ঘায় ভাঙ্গিয়া যায়, দুঃসহ বিরহ যে মিলনকে আদরে বরণ না করে, সে প্রেম একচরণ অনুষ্টুপের মত অসম্পূর্ণ। এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাই, নল ও দময়ন্তী, শ্রীবৎসরাজ ও চিন্তার জীবনে সুদীর্ঘ বিরহ-দুঃখ, সাবিত্রী ও সত্যবানের দাম্পত্যজীবনে মিলন ও পুনর্ম্মিলনের মাঝে মৃত্যুর নিষ্ঠুর ব্যবধান।

ব্যাস-বাল্মীকি-রচিত এই দুই মহাকাব্য অধ্যয়ন করিয়া কোন্ হিন্দুর না মনে হয় যে যতই কেন অলৌকিক আতিশয্যের সমাবেশ থাকুক না—"ব্যাসো ব্রুয়ান্ন সংশয়ঃ"। গিরিশচন্দ্র সেই বিশ্বাসে পুরাণ হইতে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়া পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য সকল রচনা করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র রামায়ণ হইতে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়া আটখানি নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।—

১ম—'অকালবোধন'—রাবণ-বধের পূর্বে মহাশক্তির কৃপা ভিক্ষা—দুর্গাপূজা। অন্য সাতখানির নামকরণেই বিষয়বস্তুর পরিচয়, যথা—

২য়—'রাবণ-বধ'
৩য়—'সীতার বনবাস'
৪র্থ—'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন'
৫ম—'সীতার বিবাহ'
৬ষ্ঠ—'রামের বনবাস'
৭ম—'সীতা-হরণ'
৮ম—'তপোবল'

গিরিশচন্দ্র যে ভাবে রাম-চরিত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহার কথঞ্চিৎ আভাস 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে' পাওয়া যায়। অযোধ্যা-রাজবংশের কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে শ্রীরামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—

"নরত্ব দেবত্ব কেমনে পূরিবে,
মানব তরিবে, কিসে হিত হবে
কহ মোরে, তপোধন!"

(লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, ৫ম দৃশ্য)

বশিষ্ঠদেব উত্তর দিলেন—

"ত্রেতাযুগে সত্য লোপ একপদ,
তবু সত্যাশ্রয়ই মানব-সম্পদ্
দেখাবে বর্জ্জন-গুণে।" (লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, ৫ম দৃশ্য)

অবতার লোক-লীলাস্থল পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। নিজ জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া বলিতেছেন—

"কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য—
কার্য্য বিনা নহে মোহ দূর,
নহে জ্ঞানযোগ কভু!
কার্য্যে গর্ভবতী-শাপে আপনা বিস্মৃত,
কার্য্যে জানকীবর্জ্জন,
কার্য্যে পুনঃ ধরিব চরণ—
বৃন্দাবনে গোপবালা রাধিকার;
কার্য্যে লক্ষ্মণে ত্যজিব—
দ্বাপরে পূজিব বলরামে;
কার্য্যে—বালিবধ—
বধিবে অঙ্গদ ব্যাধরূপে পুনঃ মোরে;"
(লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, তৃতীয় দৃশ্য)

পরশমণি-স্পর্শে লৌহ যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, গিরিশচন্দ্রের লেখনীস্পর্শে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ বিষয়ও তেমনি কবিত্ব-মণ্ডিত

গিরিশচন্দ্রের রাম—দেব-মানব, কোমলে কঠোরে মিশ্রিত। তাঁহার রাবণ—প্রেমিক। অবশ্য, রাম-চরিত্রে কোন ঘটনাই

তিনি নূতন সংযোগ করেন নাই, কল্পনা ও ভাবুকতায় অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। রাম-চরিত্রে যে ঘটনা দুরপনেয় কলঙ্ক—চোরাবাণে বালিবধ, গিরিশ সে সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। বালি-কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—

"শুন সত্য তত্ত্ব,
কপীশ্বর! কাল পূর্ণ তব,
পরম শিক্ষার দিন,
দেখ দিব্য জ্ঞানে
আমি মাত্র নিমিত্ত এ স্থলে।
দীননাথ দীনে করেছেন দয়া।
সুগ্রীব অধিক দীন কে বা ছিল আজি?
দীননাথ দীনে করেছেন দয়া।
দীন সহোদর তব
রাজ্যে অর্দ্ধ অধিকার;
বাহুবল অধিক তোমার,
ভয়ে ঋষ্যমূকে আছে ঋষিসনে,
না গণিলে মনে কভু;
দীননাথ শুনিল দীনের দীর্ঘশ্বাস।
মম বনবাস,
জানকী-হরণ বনে,
দীননাথ দীনে বন্ধু দিল।
এবে দীন তুমি,
দীননাথ শুনে তব মনস্তাপ।"

(সীতাহরণ—৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক)

পুরাণ-বর্ণিত ঘটনার এরূপ পরিবর্ত্তন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণেরও অননুমোদিত নহে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও উদাত্ত-চরিত্রের কলঙ্ক প্রচ্ছাদনের উপদেশই দিয়াছেন—

"যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ॥

অনুচিতমিতিবৃত্তং যথা রামস্য ছদ্মনা বালিবধঃ। তচ্চ উদাওরাঘবে নোক্তমেব। সুগ্রাব-বীরচরিতে তু বালা রাম-বধার্থমাগতো রামেণ হত ইত্যন্যথাকৃতঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

কার্য্য-কারণ তিল তিল করিয়া পরিণাম-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ নিমিত্তমাত্র, হিন্দু-কবি গিরিশচন্দ্র একথা অসংশয়ে প্রত্যয় করিতেন। সূক্ষ্ম দিব্য দৃষ্টিবলে কবির তাহা অনুভূতি হয়। 'রামের বনবাস' নাটকেও আমরা এই ভাবে এই কথা দেখিতে পাই। বনগমনের পূর্ব্বে লক্ষ্মণ বলিলেন—

"বীর্য্যহীন দৈবের অধীন,
বিধিলিপি দেখিব কেমন—
বাহুবলে লইব মেদিনী।
রঘুমণি,—ক্ষত্রনীতি আছে হেন।"

সে কথায় রাম উত্তর দিলেন—

"কার উপরে কর রোষ ভাই!
কার দোষ দিবে ইথে?
শম্বরের রণ বিধির নিয়ম, ভাই!
বিস্ফোটক বিধাতার লীলা!

বুঝ রে কৌতুক, কুবুজা-যৌতুক
বুঝ লীলা বিধাতার !"

(রামের বনবাস—অ° ৩, গ° ২)

রাম-চরিত্রের মূলমন্ত্র ছিল—প্রেম। প্রেম তাঁহার কার্য্য-প্রেরণা। জীবনের চরম সময়, লোকলীলা-স্থল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—

"হে মানব !
হের মেদ-অস্থি-নির্ম্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্য দেহ সম,
মর্ম্মে বাজে সম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম ;
তাপপূর্ণ দেহ সুখাগার প্রেমে।

প্রেমের শাসনে রামরাজ্য অযোধ্যায়।
প্রেমহেতু সীতা ত্যজি—
লঙ্ঘি অলঙ্ঘ্য সাগর
দুষ্কর সমর করিলাম যার তরে ;
রামরাজ্য আদর্শ জগতে ত্যাগ-গুণে।"

(লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, পঞ্চম দৃশ্য)

লক্ষ্মণের মুখে গিরিশচন্দ্র সত্যের মহিমা গাহিয়াছেন -

সত্যব্রত ধন্য ধরাতলে,
রাম নাম মোক্ষধাম সত্যের পালনে ;
সত্যের মাহাত্ম্য বুঝে মহাত্মা যে জন,
ত্যাগ-পরায়ণ সদা সত্যপ্রিয় যেই।"

(লক্ষ্মণবর্জ্জন, ষষ্ঠ দৃশ্য)

জীবনের সন্ধিস্থলে, সঙ্কটকালে হৃদয়-দ্বন্দ্বে, ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় অবস্থার সূত্রপাত। গিরিশচন্দ্র যে ভাবে রাম-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—তাহাতে শ্রীরাম-চরিত্রে শৌর্য্য-বীর্য্য-ধৈর্য্য এবং সহগুণ অপেক্ষা সত্যানুরাগ, স্বকীয়া প্রীতি, প্রজানু-রঞ্জন অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে সময় ক্ষত্রিয়রাজগণ প্রায়ই বহুপত্নীক ছিলেন। কেবল রামচন্দ্রই স্বর্ণ-সীতা-সহায়ে অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন; কেন-না, সস্ত্রীক নহিলে এ যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না।

বর্ত্তমান যুগের অস্পৃশ্য-জাতি-প্রীতি আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বেই মহর্ষি বাল্মীকি-কর্ত্তৃক সূচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র ও গুহক চণ্ডালের মিতালি স্মরণ করিতে আপনাদের অনুরোধ করি। গিরিশচন্দ্র মহর্ষি বাল্মীকির এই উদার সদাশয়তা তাঁহার নাট্যরচনায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

ত্রেতাযুগে যেমন রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব, দ্বাপরের শেষভাগে তেমনি ক্ষত্রিয়-শক্তি নিঃশেষে লোপ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত আর আর্য্যভূমে ক্ষত্রিয়শক্তির উদ্বোধন হয় নাই। সে সময় ক্ষত্রিয়জাতি কিরূপ দুঃসহ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে গিরিশচন্দ্র তাহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে সুব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলিতেছেন—

জান না—জান না, কৃশোদরি,
যে অনলে জ্বলে প্রাণ মম;

তাই কহি
ব্যথা দিতে করি কথা আলোচনা ;
সরলে, জান না—
দিন দিন পলে পলে কত সহি।
উন্মত্ত প্রভাবে দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কুল,
নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে—
দীন প্রজা বিকল বিগ্রহে,
কারু শস্য দহে শরানলে,
কারু গৃহ চূর রথ-সঞ্চালনে,
কষ্টার্জ্জিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে,
জায়া-পুত্র অন্ন বিনা মরে।
সন্তানে না পাঠাইলে রণে,
নৃপকোপে সর্ব্বনাশ তার।
বলাৎকার—সুন্দরী দেখিলে—
প্রমাণ বুঝহ জয়দ্রথ-আচরণে।
হীনবল দীন স্বামী—পিতা কি করিবে ?
রক্ষক ভক্ষক,—
নীরবে দারুণ ব্যথা সহে,
কারে নাহি কহে,
উষ্ণ শ্বাস সমীরণ বহে,
সে তাপে হৃদয় দহে মোর।"

(পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

বহুকাল পূর্ব্বে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক যখন গিরিশ-চন্দ্রের কল্পনায় উদয় হয় নাই, সে সময় গিরিশচন্দ্র লিখিয়া-

ছিলেন, "কৃষ্ণ কে?—ইহার উত্তর ব্যাসদেব আঠার পর্ব্বে দিয়াছেন—তাহার মর্ম্ম, কৃষ্ণ দীননাথ"।—('দীননাথ' প্রবন্ধ)

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই অবতারের কার্য্যগত সাম্য ও বৈষম্য সামান্য পর্য্যালোচনাতেই ধরা পড়ে। উভয়েই দীননাথ—উভয়েরই জীবনাদর্শ ছিল অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্মের স্থাপন। বাহুবল-দৃপ্ত স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের অযথা অত্যাচার দমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আদর্শ ত্যাগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা যেমন শ্রীরামচন্দ্র অবতারের অন্যতম গূঢ় উদ্দেশ্য—দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়-কুলের দর্প চূর্ণ করিয়া ভারতে আদর্শ ক্ষত্রিয়-রাজ্য সংস্থাপনই ছিল তেমনই শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মূল রহস্য। পরশুরামও ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার সম্মিলিত ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্র বল আদর্শ ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কুল পুনঃ পুনঃ নির্ম্মূল করিয়াও তিনি ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন নাই। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়পণ ছিলেন বলিয়া তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত-প্রাণ পরীক্ষিতের রাজ্যে কলির প্রভাব পর্য্যন্ত প্রতিহত হইয়াছিল।

✓ অতঃপর আমরা 'জনা' দৃশ্যকাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

"Jana is the picture of Mahakali." মহাকালী যেরূপ মহাকালকে পদদলিত করিয়া সন্তানের ভয়-নিবারণ-জন্য খড়্গ ধারণ করেন—জনার চরিত্রেও আমরা সেই মহামাতৃ-ভাবেরই ছবি দেখিতে পাই। তিনি পুত্রের জন্য স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজা যখন শান্তিকামনায় যুদ্ধ

চাহিতেছিলেন না, রাজ্ঞী জনা পুত্রের ক্ষাত্রধর্ম্মরক্ষার্থে রাজাকে বলিলেন—

"এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথা—সারথি হইব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।"
(জনা—প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)

'জনা'র বিষয়বস্তু পুত্র-বাৎসল্য,—যে বাৎসল্য পতিকে পদদলিত করিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া লয়, সেই বাৎসল্য। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, মহাকবি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে—'নীলধ্বজের প্রতি জনা' নামক পত্র হইতে 'জনা'-চরিত্রের আভাস গৃহীত।

এই নাটকের বিদূষক-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহার কাছে মহাকবি শেক্সপীয়ার রচিত 'কিং লীয়ার' নাটকের বিদূষক (Fool) সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। এই চরিত্রের সকল উক্তি-প্রত্যুক্তিই বক্রোক্তি। যাঁহারা গিরিশচন্দ্রকে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বক্রোক্তির ভিতর দিয়া কেমন করিয়া ভক্তিরস ফুটিয়া উঠে। এই চরিত্রের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে অগ্নিদেব বলিতেছেন—

"এক নামে মুক্তি পায় নরে—
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।"
(জনা, ১।১)

ব্রাহ্মণ সরল-বিশ্বাসী, নির্ভীক, রাজকল্যাণসাধনে তৎপর, সত্যভাষী।

জনা—প্রতিশোধ-পরায়ণা, তেজস্বিনী নারী। নীলধ্বজ যখন বলিলেন—

"রণ যদি আকিঞ্চন তব, বীরাঙ্গনা,
যাও রণে নন্দনে লইয়ে,
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে বাদী।"

(জনা, ১।৪)

তেজস্বিনী জনা উত্তর দিলেন—

"দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই ;
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী—সারথি হইব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।
নারায়ণ অরিরূপী যার,
করগত গোলোক তাহার ;
সুসময় উদয়, ভূপাল !
অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।
রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।"

(জনা, ১।৩)

অতঃপর যখন প্রবীর-পত্নী মদনমঞ্জরী ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে শ্বশ্রূকে মিনতি করিল—

"শুনেছি, মা, অমঙ্গলধ্বনি আজি—
যেন দূরে মৃদুস্বরে
কাঁদে কে প্রভুর নাম স্মরি।"

বীরাঙ্গনা জনা তখনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ কুল হ'তে ?
যুদ্ধকার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে তথা অমঙ্গল আশঙ্কা সর্ব্বদা।
কিন্তু তোর সম
শুনি দূর সমীরণ-ধ্বনি—
রোদনের ধ্বনি অনুমানি,
অকল্যাণ চিন্তা কে বা করে ?
আরে হীনমতি,
পতিভক্তি এই কি তোমার ?"

(জনা, ২।১)

গিরিশচন্দ্র মহাভারত হইতে দুইটি কিশোর-বীরচরিত চিত্রিত করিয়াছেন—প্রবীর ও অভিমন্যু।

অন্যান্য রস থাকিলেও গিরিশচন্দ্র 'জনা' দৃশ্যকাব্যে প্রধানতঃ তিনটি রসের সমাবেশ করিয়াছেন—বাৎসল্য, বীর ও রৌদ্র (প্রতিহিংসা)। আমরা অঙ্কে অঙ্কে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

প্রথম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—রাজ-জামাতা বৈশ্বানর কল্পতরু হইয়া বর দিতেছেন—

মাহিষ্মতী পুরীর অধিপতি নীলধ্বজ অচিরে হরি-দর্শন পাইবেন। রাজরাণী জনা গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিবেন। রাজকুমার প্রবীর ভুবনবিজয়ী অরির সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। রাজকন্যা স্বাহা বর চাহিলেন—যেন পতিপদে "নিরবধি স্থির রহে মতি।"

২য় গর্ভাঙ্ক—প্রবীর-কর্তৃক পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরিয়া আনিবার সংবাদে প্রবীর-পত্নী মদনমঞ্জরীর ভীতি ও অশ্ব ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত পতিকে মিনতি।

৩য় গর্ভাঙ্ক—হস্তিনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও অর্জ্জুন-সহ মিলন। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে এই দৃশ্যকাব্যের বীজ উপ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"সত্য কহি,
শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন
বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।"

৪র্থ গর্ভাঙ্ক—নীলধ্বজ প্রবীরকে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলে প্রবীরের অভিমান ও মাতৃ-সন্নিধানে গমন। রাজা আসিয়া পুত্রকে রণে যাইতে নিবারণ করিবার জন্য রাণীকে অনুরোধ। সে সম্বন্ধে রাজা ও রাণীর উক্তি-প্রত্যুক্তি আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

৫ম গর্ভাঙ্ক—কৈলাসে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মহাদেবের নিকট প্রবীর-যুদ্ধে বিজয়-প্রার্থনা।

মহাদেব বর দিলেন—

"মাতৃপদ-ধূলি লয়ে পশিলে সমরে,
শূল নাহি স্পর্শিবে তাহায়।
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে।
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে
মাতৃনাম যেই দিন না লভে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।"

দ্বিতীয় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—জনার গঙ্গাপূজা ও প্রবীরের জন্য বিজয়-প্রার্থনা। পুত্রবধূ মদনমঞ্জরী আসিয়া মিনতি করিলেন—

"রণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।"

জনার তিরস্কার—আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।
সঙ্কটে স্বাহার উপদেশ—

"চল সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে,
কৃষ্ণগুণ-গানে তুষ্ট করি ফাল্গুনেরে
মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল।"

২য় গর্ভাঙ্ক—দুইজন গঙ্গারক্ষক-দ্বারা অশ্বমেধের অশ্বের অনুসন্ধান। বিদূষক-কর্ত্তৃক পথপ্রদর্শন।

৩য় গর্ভাঙ্ক—মন্ত্রী ও সেনাপতির পরামর্শ, জনার উৎসাহ-দান।

৪র্থ গর্ভাঙ্ক—শ্রীকৃষ্ণ-শিবিরে ভিখারিণীর ছদ্মবেশে মদন-মঞ্জরী ও স্বাহা আসিলে শ্রীকৃষ্ণ জাহ্নবীর নামে যুদ্ধাস্ত্র দান করিয়া বলিলেন—

"হের অসি, যম বসে অসিধারে,
উপহার দিয়াছেন জাহ্নবী প্রবীরে।
অর্জ্জুন বা নারায়ণ ত্রিপুরারি কিবা,
এই সাজে সুসজ্জিত হইলে কুমার,
সমরে প্রবীরে কেহ নারিবে আঁটিতে।"

ম গর্ভাঙ্ক—মদনমঞ্জরী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত রণসজ্জা দান করিয়া বলিল—

"একমাত্র নিষেধ মা তাঁর,
যতদিন পাণ্ডব না ফিরে হস্তিনায়,
শয়নে ভোজনে,
রণসাজ ত্যজিতে নিষেধ।"

প্রবীরের রণসজ্জা।

৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক—গঙ্গারক্ষক ও বিদূষক।

গঙ্গারক্ষক বলিল—"ঠাকুর, তুমি রাজ্ঞীকে গিয়া বল, শঙ্কর বিমুখ, যুদ্ধে জয় হবে না।" সে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিল।

৭ম গর্ভাঙ্ক—প্রথম যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পরাজয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে,
প্রবীর পড়িবে রণে অর্জ্জুনের করে।"

৮ম গর্ভাঙ্ক—প্রবীরের মনে কামোদ্রেক।

তৃতীয় অঙ্ক, ম গর্ভাঙ্ক—প্রবীরের পদস্খলন।

২য় গর্ভাঙ্ক –প্রবীরের অদর্শনে উদ্বেগ—জনার হরগৌরী-নিন্দা।

৩য় গর্ভাঙ্ক—দ্বিতীয় বার যুদ্ধের উদ্যোগ।

৪র্থ গর্ভাঙ্ক—প্রবীরের আত্মগ্লানি। অর্জ্জুন-প্রবীরের যুদ্ধ, প্রবীরের মৃত্যু। জনা ও মদনমঞ্জরীর শোক, মদন-মঞ্জরীর মৃত্যু।

চতুর্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—দূত-কর্ত্তৃক পুত্রবধ-সংবাদ-প্রদান। প্রতিশোধপরায়ণা চামুণ্ডা-রূপিণী জনার পাণ্ডব-শিবিরে আগমন।

২য় গর্ভাঙ্ক –গৃহ-বিগ্রহ ও গ্রাম্যদেবতা ভগ্ন করিতে বিদূষকের সঙ্কল্প।

৩য় গর্ভাঙ্ক– রাজপ্রাসাদে অতিথিরূপে ভীমার্জ্জুনের আগমন। প্রবীরের রণ-গৌরব-প্রশংসা।

অর্জ্জুন বলিলেন—

"আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন, নরনাথ,
যম সম শত্রু হ'লে পৃষ্ঠ নাহি দিব.
সে গর্ব্ব হয়েছে খর্ব্ব কুমারের রণে।"

শ্রীকৃষ্ণ আতিথ্যগ্রহণে ব্যাকুল। সংবাদ-শ্রবণে বিদূষক অগ্নিদেবকে বলিল, "যা হোক, খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ দেবতা! বাস্তুবৃক্ষটি পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না। এখন যান, আর কোন ভাগ্যবান্ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। জামাই-আদরে দিনকতক খান, শেষটা একদিন ভোরে উঠে কল্পতরু হ'য়ে

বর দেবেন।” (—বক্রোক্তির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এ স্থল উদ্ধৃত করা হইল।) রাজার কাছে বিদূষকের বিদায়গ্রহণ। রাজাদেশে নগর সুসজ্জিত। জনা আসিয়া নীলধ্বজকে তিরস্কার করিলেন—

“.........উন্মত্তের প্রায়—
শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উল্লাস।”

রাণীর এ তিরস্কার পরাধীন আত্মবিস্মৃত সমগ্র ভারতবাসীকে। তৎপরে জনার ভর্ৎসনা—

“শত্রু যদি প্রবল, রাজন্,
জয় আশা না থাকে বিগ্রহে,

মিলি বামাদলে,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পশি
শোকানল করিব নির্ব্বাণ।”

এ কয় ছত্র আমাদিগকে রাজপুতানার ‘পদ্মিনী-উপাখ্যান’ স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজার নিকট হইতে জনার চিরবিদায়-গ্রহণ।

৪র্থ গর্ভাঙ্ক—বালকগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-গান। দর্শকগণের অন্তরে কোমলভাব উদ্দীপন করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য—যাহাতে জনার মনোভাব ও মাতৃত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

৫ম গর্ভাঙ্ক—উন্মাদিনী জনা।

পঞ্চম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক—প্রান্তরমধ্যস্থ শুষ্ক তরুতল—বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর রাধা-কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দর্শন।

২য় গর্ভাঙ্ক—নীলধ্বজের নিকট হইতে অগ্নি ও স্বাহার বিদায়-গ্রহণ।

৩য় গর্ভাঙ্ক—জনার কাতর প্রার্থনায় বনপথে গঙ্গার আবির্ভাব।—

"তরঙ্গিণী বাঁশরীবয়ান
ভক্তে মোক্ষ প্রদানিতে।
যার যেই ভাব—
লাভ তার সেইরূপ।"

(৫ম অ°, ২য় গ°)

নীলধ্বজ-মহিষী গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ। পরে কৈলাস-শিখরে জনা, প্রবীর ও মদনমঞ্জরীর ছায়ামূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজাকে বলিলেন—

"প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ, মন কর স্থির।"

মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার-রচিত করুণরসাশ্রিত 'কিং লীয়ার' নাটকও এইরূপ শান্তিরসে সমাপ্ত হইয়াছে—

"Vex not his ghost: O, let him pass! he hates him,
That would upon the rack of this tough world
Stretch him out longer."

(*King Lear*, Act V, Sc. 3)

গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বশেষ নাট্যরচনাটি পৌরাণিক। পুরাণ হইতে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়া তিনি 'তপোবল' লিখিয়া-

ছিলেন। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, Mill's Theory of Utility এ নাটকের কল্পনামূলে—

"একতাবন্ধন !
কিন্তু কোন্ সাধারণ প্রয়োজনে
একতাবন্ধনে রবে জীব ধরাতলে ?
একতার মূল প্রয়োজন।
.. ..
তর্ক অতি চমৎকার—
কিন্তু দোষ মূলে !—
প্রয়োজন বিনে
একতাবন্ধনে কভু না মানব রবে।"

এই গ্রন্থই গিরিশ-প্রতিভার শেষ দীপ্তি। ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়শক্তির মধ্যে অন্যতরের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন নাট্যকারের অভিপ্রায়। কবি মহতী কল্পনার বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঐশী শক্তির অধিকারী হইয়া আত্মত্যাগী হইলেই মহত্ত্ব; নহিলে মহাশক্তির অর্জ্জন কেবল অনিষ্টের কারণ। গিরিশ বলিতেন, 'There is a noble satisfaction in self-sacrifice, which only the noble can feel.'

'তপোবল' নাটকে একটি হাস্যরসের উৎস আছে—সদানন্দ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের বিদূষক প্রধানতঃ প্রেমদূত। কিন্তু 'তপোবল' নাটকের সদানন্দ আত্মত্যাগ-মহিমায় সমুজ্জ্বল।

পুরাণ হইতে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়া গিরিশচন্দ্র সর্ব্ব-

সাকল্যে যতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

রামায়ণ আটখানির তালিকা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মহাভারত—(১) 'অভিমন্যু-বধ'। (২) 'পাণ্ডব-গৌরব'। (৩) 'বৃষকেতু'। (৪) 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। (৫) 'জনা'।

পুরাণ—(১) 'ধ্রুবচরিত্র'। (২) 'প্রহ্লাদচরিত্র'। (৩) 'দক্ষ-যজ্ঞ'।

মহাভারত-সম্পর্কিত— (১) 'শ্রীবৎস-চিন্তা' — গিরিশ বলিতেন —ইহার আখ্যানবস্তু 'মহাভারত' হইতে সংগৃহীত। ইহাতে বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের ছায়া আছে। (২) 'নল-দময়ন্তী'।

শ্রীকৃষ্ণচরিত—(১) 'প্রভাস-যজ্ঞ'। (২) 'নন্দদুলাল'। (৩) 'দোললীলা'। (৪) 'ব্রজ-বিহার'। (৫) 'মণিহরণ'।

ইহা ছাড়া 'ভক্তমাল' হইতে গৃহীত (১) 'বিল্বমঙ্গল', (২) 'করমেতি বাই' ও (৩) 'বিষাদ' গ্রন্থের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

সামাজিক নাটক-রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন হইলেও পৌরাণিক নাটক তাঁহার শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি - কল্পনার উচ্চতম বিকাশ। অনেকের মতে 'প্রফুল্ল' তাঁহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। কিন্তু উহাও যে-কোন পৌরাণিক নাটকের সমশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। বিষয়-গৌরবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের কল্পনার গগন-স্পর্শী উচ্চতা, গভীর ভাবধারা. রসের অফুরন্ত প্রবাহ, চরিত্র-চিত্রের বর্ণ-বিন্যাস সবই চিত্তগ্রাহী মনে হয়—

"কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা!"

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক রচনাগুলি যেন ভাব-রস ও ভাষার একতান প্রবাহ। তিনি নিজ হস্তে পুস্তক লিখিতেন না। মুখে একটানা বলিয়া যাইতেন, একজন লিখিয়া লইতেন। এমনি করিয়া সর্ব্বসমেত তিনি আশী-বিরাশী খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন সহানুভূতি ব্যতীত ক'বর হৃদয়দ্বার উদঘাটিত হয় না। গিরিশচন্দ্রকে জানিতে—বুঝিতে হইলে যে হৃদয় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি. কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গাথায় আজিও অজস্রে অশ্রু বর্ষণ করে, সেই প্রেম-ভক্তি-করুণা-বিগলিত রস-পিপাসু হৃদয়ের প্রয়োজন। বাঙলার প্রকৃতি যেমন শ্যামলা ও কোমলা, গিরিশচন্দ্রের ভাব-ভাষা-ছন্দও তেমনি অপরূপ শ্রীসম্পন্ন ও সুকোমল। তিনি নাটকরচনায় প্রাচীর রুচি ও প্রতীচীর প্রথা সমন্বয় করিয়া অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। গিরিশের মর্ম্মরমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে তাহা চান নাই। তিনি আপনার স্মৃতি আপনি রাখিয়া গিয়াছেন। গিরিশ তাঁহার রচনায় চিরজীবী। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস. কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মর্ম্মরমূর্ত্তি বা তৈলচিত্র নাই। কিন্তু আজিও তাঁহারা বাঙ্গালার অন্তর-সিংহাসনে রাজাধিরাজরূপে অধিষ্ঠিত।

গিরিশচন্দ্রের নশ্বর দেহ কালে লীন হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত গিরিশ তাঁহার রচনায় অমর কেবল তাহাই নয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের ন্যায় এই মহাকবিকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষা অমর হইয়া থাকিবে। মানুষ জন্ম গ্রহণ করে এবং মরে। কিন্তু প্রকৃত কবি কেবল জন্ম গ্রহণই করেন—কখন মরেন না। গিরিশ কি মৃত ?—না !—গিরিশ জীবিত এবং আরও বেশী করিয়া জীবিত—যেমন

সকল ভূমির সকল মহাকবি—ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, কৃত্তিবাস-কাশীদাস—জীবিত, এবং চিরদিন জীবিত থাকিবেন। প্রতিভার পুষ্পহার মহাকালের কণ্ঠভূষণ। তাই কাব্য কালজয়ী, কবি চিরজীবী।